অন্ধকারে ফুলের গন্ধ

প্রফুল্ল রায়

প্রকাশন বিভাগ
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : অক্ষয়-তৃতীয়া ১৩৭০

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

মানুষের জন্য

আমাকে দেখুন

কেয়া পাতার নৌকো

॥ এক ॥

শহরতলীর ডাউন লোকাল ট্রেনটা এইমাত্র দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। ছটফটে গাড়িটা তিরিশ সেকেণ্ডও দাঁড়াল না, ঝপ করে ক'টি যাত্রী নামিয়ে ক'জনকে কুড়িয়ে আবার ছুট লাগাল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে সবুজ রঙের একটা ফুটকি হয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

দু ঘণ্টা আগে সকাল হয়েছে। এখন আটটা সাড়ে আটটার মতো বাজে।

এধারে অর্থাৎ এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওভারব্রিজের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অমিত। সে কলকাতায় যাবে। শহরতলীর ডাউন লোকালটা যেদিকে গেল তার ট্রেন সেদিক থেকেই আসছে। লেট-টেট না করলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

অমিতের বয়স আটাশ-উনত্রিশ। নাক-মুখ কাটা কাটা, সরু কোমর, জোড়া ভুরুর নিচে শান্ত অনুজ্জ্বল চোখ। গায়ের রং কালোও না ফর্সাও না, দুয়ের মাঝামাঝি। বেশ চওড়া কপাল অমিতের ; ঘন চুল পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। ক'বছর ধরে তাব ওপর দিয়ে অনেক কিছু বয়ে যাচ্ছে—যেমন হতাশা, ফাসট্রেসন, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব সত্ত্বেও এখনও সে আকর্ষণীয়।

অমিতের পরনে আপাতত 'মড' ছোকরাদের মতো টেরিকটের বেলবটস এবং বুশ শার্ট, তার ওপর দামী উলের পুলওভার ; পায়ে নকশা-করা চপ্পল। বেলবটস চপ্পল বা পুলওভার—কোনটাই কিন্তু তার নিজস্ব না। মেজো ভাই বাসু আর ছোট ভাই সানুর কাছ থেকে একবেলার জন্য ওগুলো চেয়ে নিয়েছে। নিজের বলতে খেলো

কাপড়ের আধ-পুরনো দুটো ফুল প্যাণ্ট আর দুটো শার্ট ছাড়া কিছুই নেই অমিতের। বিশেষ কোন দরকারে বেরুতে হলে কিম্বা কারো সঙ্গে জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে পোশাক-টোশাকের জন্য ছোট দুই ভাইয়ের কাছে তাকে হাত পাততে হয়।

ওভারব্রিজের তলায় দাঁড়িয়ে একবার ওধারের প্ল্যাটফর্মটার দিকে তাকাল অমিত। ডাউন ট্রেনটা থেকে যারা নেমেছিল ধীরেসুস্থে তারা চলে যাচ্ছে; প্ল্যাটফর্মটা ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে আসছে। হঠাৎ ওদের মধ্যে নীলাকে—হ্যাঁ নীলাই তো—দেখতে পেল অমিত, সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল যেন। তারপরেই জামার তলায় অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল সে।

অমিত জানে প্রায় রোজই সন্ধ্যের কোন একটা ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে যায় নীলা। ফেরে লাস্ট ট্রেনে, রাত বারোটা একটায়। কখনও কখনও ফিরতে পরের দিন সকাল হয়ে যায়। যেমন আজ হয়েছে। সপ্তাহে কম করে দু-তিন দিন নীলায় সঙ্গে এই স্টেশনেই দেখা হয় অমিতের। অবশ্য মাঝে-মধ্যে দশ-বারো দিনের জন্য কোথায় যেন উধাও হয় মেয়েটা, তখন দেখাটা আর হয়ে ওঠে না। তবে যখনই দেখা হয়, অমিত অনুভব করে সেই অদৃশ্য পোকাটা তার শরীরের ভেতর কোথাও হাঁটছে।

অমিত যে ওভারব্রিজটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেটা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে দুনম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নেমেছে। সে দেখতে লাগল, ও-পাশের সিঁড়ি ভেঙে নীলা ব্রিজে উঠছে। খানিকটা উঠে নীলা থামল, হয়তো উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। একটু জিরিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টেনে আবার উঠতে লাগল।

দু মিনিটও লাগল না, ওভারব্রিজ পেরিয়ে ও-ধারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমিতের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল নীলা। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, গায়ের রঙ মাজা মাজা, ঘাড়

পর্যন্ত ছাঁটা। তেলহীন রুক্ষ বাদামী চুল এখন এলোমেলো হয়ে আছে। সরু তুলিতে টানা ভুরু নীলার, তার নিচে চোখ দুটো এই মুহূর্তে ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। দেখেই বোঝা যায় এসব অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণের ফল। ঈষৎ ভারী ধরনের ঠোঁট নীলার। সেই ঠোঁটে এবং গালে কাল হয়তো রঙ করেছিল, লিপস্টিক আর এনামেল আজ ফিকে হয়ে গেছে।

নাক-মুখ-থুতনি-গলা আলাদা আলাদা করে দেখলে কোন বিশেষত্ব নেই। তবু সব মিলিয়ে এখনও মেয়েটার চেহারায় এমনি একটা জাদু আছে যা ভালো লাগে।

তিন-চার বছর আগেও নীলাব দিকে তাকালে চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যেত। তার সারা গায়ে পিলসুজের নরম আলোর মতো কি এক আভা যেন মাখানো ছিল। সেই চেহারা আর নেই। কণ্ঠা আর গালের হাড় গজালের মাথার মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। যৌবনের টাটকা সতেজ লাবণ্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে এ কবছরে। তার বদলে নীলার মুখে এখন এক ধরনের কর্কশ রুক্ষতা, তার কথা বলা বা তাকানোর ভঙ্গি খুবই উগ্র। চেহারায় সব সময় যেন যুদ্ধ করার ভাব।

এই মুহূর্তে নীলার গায়ে হলুদ জমির ওপর ছোট ছোট ময়ূর ছাপ দেওয়া প্রিন্টেড শাড়ি আর দামী গরম কোট, পায়ে কারুকাজ-করা স্লিপার। গলায় দশ-বারো টাকা দামের দার্জিলিং পাথরের সস্তা হার, বাঁ হাতে ছেলেদের মতো চৌকো ঘড়ি, ডান হাতে ফ্যাশনেবল ব্যাগ।

অনেক দিন বাদে, দু-তিন বছর তো হবেই, এত কাছ থেকে নীলাকে দেখল অমিত। ওর চুল থেকে শাড়ি-টাড়ি থেকে পারফিউমের হাল্কা গন্ধ উঠে আসছে।

অমিত তাকিয়েই ছিল। তার সেই অস্বস্তিটা বাড়ছেই। সেই সঙ্গে এক ধরনের সংকোচ আর ভয়ও ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছিল।

কাছাকাছি এসে নীলাও তার দিকে তাকিয়েছে। এখন নীলার চোখে সেই ঘুমন্ত ঢুলুঢুলু ভাবটা নেই, দৃষ্টি স্থির এবং পলকহীন।

অমিত জানে কলকাতা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই রানীবাজার শহরের প্রতিটি মানুষের দিকেই নীলা উগ্রভাবে তাকায়। একমাত্র সে ছাড়া। নীলা যখন তাকে ছাখে তার চোখে কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা মাখানো থাকে।

আজও সেই বিষণ্ণ ছায়াটা লক্ষ করল অমিত। সে কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। আবার মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাও সম্ভব হচ্ছিল না। একটা ফাঁদে আটকে গেছে সে।

অন্য দিনও অমিতকে দেখলে দাঁড়িয়ে যায় নীলা। তারপর যখন ছাখে অমিত একটা কথাও বলছে না, সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো মুখ করে আছে, আস্তে আস্তে চলে যায়। অমিতের ভেতরে যে প্রতিক্রিয়াই চলতে থাকুক বাইরে অন্তত বোঝা যায় না—নীলাকে সে চেনে বা কখনও তাকে দেখছে।

আজ কিন্তু নীলা চলে গেল না। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, 'কেমন আছেন?' তার কণ্ঠস্বর কোমল শোনাল, তবে তার সঙ্গে একটু খসখসে ভাব মেশানো, হয়তো রাত জাগার জন্য।

কতদিন বাদে নীলা তার সঙ্গে কথা বলল? এক বছর দু বছর, না আরো বেশি? দ্রুত একবার ভাবতে চেষ্টা করল অমিত, মনে পড়ল না। নীলার প্রশ্নের উত্তরটা এক কথায় দেওয়া যায়, অমিত দিল না। অপরিষ্কার গলায় শুধু বলল, 'এই চলে যাচ্ছে।'

'ছুটির দিন স্টেশনে? কোথাও যাচ্ছেন নাকি?' আগ্রহশূন্যের মতো এবার জিজ্ঞেস করল নীলা।

আজ রবিবার স্টেশনে লোকজন তেমন ছিল না। একটু চুপ করে থেকে অমিত বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায়—'

'কাজ আছে?'

'হ্যাঁ।'

নীলা এবার বলল, 'চাকরি-টাকরি তো এখনও হয়নি—'

'না, হল আর কই—' নিরাসক্তভাবেই বলতে চাইল অমিত, তবু তার কণ্ঠস্বরে হতাশা গোপন থাকল না। বলেই কিন্তু সে একটু চমকে উঠল। তার যে এখনও চাকরি হয়নি, নীলা জানল কি করে? সে কি তার খবর রাখে?

নীলা বলল, 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আজকাল যান?'

অমিতের মনে পড়ে গেল, তিন-চার বছর আগে নীলা আর সে পনের-কুড়ি দিন পর পর একবার করে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যেত। তারপর হঠাৎ একদিন যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল নীলা। আবছাভাবে সে বলল, 'যাই মাঝে মাঝে।'

একটু ভেবে নীলা বলল, 'গাঙ্গুলি এখনও ওখানে আছে?'

গাঙ্গুলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের একজন ছোটখাটো অফিসার। বয়স, যোগ্যতা এবং কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন অফিসে চাকরিপ্রার্থীদের নাম পাঠায় সে। অমিত আর নীলা ওদের নাম পাঠাবার জন্য কতদিন গাঙ্গুলিকে ধরেছে, 'আপনি আমার বাবা, বাঁচান—' এটুকু বলা ছাড়া যত রকম ভাবে সম্ভব তোষামোদ করেছে। হাতজোড় করে মন্দির-টন্দিরে মানুষ যেভাবে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

অমিত বলল, 'আছে।'

খুবই সাধারণ কথাবার্তা। তবু নার্ভাস হয়ে পড়ছিল অমিত। নীলা তাকে লক্ষ করতে করতে কী বুঝল সে-ই জানে। সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'ভয় করছে?'

অমিত চমকে উঠল। মেয়েটা তার মানসিক অবস্থা ধরে ফেলেছে নাকি? টেলিপ্যাথি? ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি অমিত বলল, 'না-না, ভয় করবে কেন?'

'তবে কি ঘেন্না?'

আধবোজা গলায় অসহায়ের মতো অমিত বলল, 'ঘেন্নাই বা হবে কেন?'

'যাক, বাঁচা গেল—' চোখ কুঁচকে নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিল নীলা।

ঠিক বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে অমিত জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'ভেরি সিম্পল। আমাদের রানীবাজারে এই একজনকে তবু পাওয়া গেল যে আমাকে ঘেন্না করে না, ভয়ও পায় না।' বলতে বলতে আলস্যের হাই তুলল নীলা।

আর তখনই তার মুখ থেকে যে গন্ধটা নাকে এসে লাগল, অমিত সেটা চেনে। গন্ধটা বাসি হুইস্কির। যাই হোক, সে নীলার কথার উত্তর দিল না।

নীলা আবার বলল, 'অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছা হল। হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন—'

'আরে না-না—'

'বিরক্ত হলেও কি আর বলবেন! আফটার অল জেণ্টলম্যান—'

অমিত ফিকেভাবে হাসল, কিছু বলল না।

নীলা এবার বলল, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা চলি।' বলেই অমিতের পাশ দিয়ে ক'পা এগিয়ে টিকেট-কালেক্টারের হাতে টিকেট জমা দিল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার অমিতকে দেখল, তারপর স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

স্টেশনের গায়ে সাইকেল রিকশার স্ট্যাণ্ডটা এখান থেকে চোখে পড়ে। অমিত দেখল স্ট্যাণ্ডে গিয়ে শম্ভুর রিকশায় উঠে বসেছে নীলা। সে জানে শম্ভু নীলার বাঁধা রিকশাওলা। শম্ভু লাস্ট ট্রেন আসার সময় অর্থাৎ রাত বারোটায় স্টেশনে এসে নীলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। নীলা রাত্তিরে না ফিরলে পরের দিন সকালে আবার আসে, যেমন আজ এসেছে।

শম্ভুকে কিছু বলতে হয় না। নীলা উঠে বসলেই সামনের দিকে

রাস্তাটা মেরুদণ্ডের মতো রানীবাজারের গা ফুঁড়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে বেশ বাজাতে বাজাতে সেটার ওপর দিয়ে দারুণ স্পীডে রিকশা চালিয়ে দেয় শম্ভু। আজও দিল। নীলা কোথায় যাবে সে জানে।

অমিত লক্ষ করেছে রিকশায় উঠে ব্যাগ থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে ধরিয়ে নিয়েছিল নীলা। রিকশাটা ক্রমশঃ দূরে আরো দূরে চলে যাচ্ছে। সে অস্পষ্টভাবে ভাবল, যতক্ষণ না নীলা ঢালীপাড়ায় তাদের বাড়ি পৌঁছুচ্ছে বাস্তার দু ধারের দোকানপাট বাড়ি-ঘর থেকে অগুনতি চোখ তাব গায়ে ক্রমাগত পেরেক ফোটাতে থাকবে, নীলা অবশ্য গ্রাহ্য করবে না।

নীলা সিগারেট খায় কিনা, অমিত জানে না। হয়তো খায়; আবার না-ও খেতে পারে। তবে রানীবাজারে রাস্তায় রিকশা করে যেতে যেতে সে যে সিগারেট ধরিয়ে নেয়—অমিত জানে এটা নিতান্তই আক্রোশবশতঃ। তার মতো বাঙালী মেয়ের পক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার নাকের ওপব দিয়ে ওভাবে সিগারেট ধরিয়ে যাবাব কথা নয়। সব কিছু বাদ দিয়েও লজ্জা সংকোচের একটা ব্যাপার আছে, নিন্দা এবং দুর্নামের ভয় আছে। বাঙালী মেয়ের সিগারেট খাওয়া কেউ কি আর ভালো চোখে দ্যাখে; সবার কাছেই এটা একটা কুকীর্তি।

অমিতের মনে আছে, প্রথম প্রথম সিগাবেট ধবিয়ে নীলা যখন রানীবাজারে রাস্তা দিয়ে যেত, দুধার থেকে ছোকরারা টেনে-টেনে কাঁপিয়ে সিটি মারত, কেউ কেউ হিন্দী ফিল্মের হীবোদের মতো সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গাইত, 'রুখ যা ও যানেবালী, রুখ যা—'। যাদের বয়স একটু বেশি তারা গলার স্বর মোটা করে বলত, 'কালী এবার তোমায় খাব।' আর বয়স্করা বলত, 'ছুঁড়ির বারোটা বেজে গেছে।' নীলা কিন্তু কোনদিকে তাকাত না; সারা মুখে কঠিন তাচ্ছিল্য আর রুক্ষতা এঁকে চুপচাপ বসে থাকত।

এই দৃশ্যটা ক্রমশঃ রানীবাজারের অধিবাসীদের গা-সওয়া হয়ে এসেছে। আজকাল তারা অবশ্য কিছু বলে না। তবে নীলা যখন ওই রাস্তায় রিকশা করে যায়, ঘাড় ফিরিয়ে সবাই একবার তাকাবেই।

নীলার কথা কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবা গেল না। কলকাতার ট্রেনটা ওধার থেকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। ছুটির দিনের ফাঁকা গাড়িতে উঠে জানলার ধারে গিয়ে বসল অমিত। আর বসতে না বসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

॥ দুই ॥

জানুয়ারি মাস শেষ হতে চলেছে। এ-সময় আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার থাকার কথা।

অন্য দিন এই বেলা আটটা সাড়ে আটটার আরামদায়ক উষ্ণ রোদে চারদিক ভেসে যায়। কিন্তু আজ ভোরে একশো মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের বায়ুমণ্ডলে কিছু একটা ঘটে গেছে। তার ফলে শীতের আকাশ ঢেকে দিয়ে কালো কালো ভারী মেঘ জমতে শুরু করেছে। সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না, তবে একটু-আধটু রোদ এখনও চোখে পড়ে। মেঘেদের ধারে ধারে সেই রোদটুকু রুপোলী জরির পাড় বুনে যাচ্ছে।

জানালার ফ্রেমে থুতনি রেখে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে অমিত। সাবার্বন ট্রেনটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। বাইরে কোন বিস্ময় নেই, সবই পরিচিত দৃশ্য—শীতের মজা খাল, কচুরিপানা, বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা, ফসলহীন ধু-ধু মাঠ, তার পরেই হয়তো কোন জমজমাট কারখানা-শহর, বস্তি, চার-পাঁচ মিনিট পর পর শহরতলীর একেকটা স্টেশন। এ-সব পেরিয়ে আবার মাঠ-খাল-ঢ্যাঙা চেহারার তালগাছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত তাকিয়েই আছে শুধু; বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কিছুই যেন চোখে পড়ছিল না। বহুকাল বাদে নীলা আজ তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাও মাত্র পনের-কুড়ি মিনিট আগে। এমন একটা দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাও তার মনে নেই। অমিত অন্য কথা ভাবছিল। এগারোটার মধ্যে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

রাস্তায় কোনরকম ঝামেলা-টামেলা না হলে এই সাবার্বন ট্রেনটা

ন'টা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশে শেয়ালদা পৌঁছুবে, স্টেশন থেকে বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে মিনিট পাঁচেক। বাসের জন্য নিশ্চয়ই দশ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে হবে না। তার মানে ন'টা চল্লিশের সঙ্গে পনের যোগ করলে ন'টা পঞ্চান্ন। একটা এইট-বি ধরে দেশপ্রিয় পার্কে যেতে আরো তিরিশ-চল্লিশ মিনিট। তারপরও হাতে আধঘন্টার মতো সময় থেকে যাবে। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে সাদার্ন এ্যাভেনিউ আর কতটুকু! মনে মনে যে অঙ্কগুলো সে কষছিল, সেগুলো ঠিক ঠিক মিলে গেলে এগারোটার মধ্যেই মল্লিক সাহেবের নতুন ফ্ল্যাটটায় পৌঁছুতে পারবে।

দিন সাতেক আগে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে ওঁদের শ্যামবাজারের বাড়িতে দেখা হয়েছিল। হেসে হেসে তখন তিনি আভাস দিয়েছিলেন শিগগিরই একটা ভালো খবর দিতে পারবেন; সুসংবাদটা শুনবার জন্য আজ এগারোটায় সাদার্ন এ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে আসতে বলেছেন।

মল্লিক সাহেব হাইড-রোডে একটা বড় হেভি ইঞ্জিনীয়ারীং ফ্যাক্টরির ওয়ার্কস ম্যানেজার; জার্মাণ কোলাবরেশনে তৈরি এই কারখানাটার ওয়ার্কার হাজার চারেক। এক বছর ধরে অমিত তাঁর গায়ে আটকে আছে। যে-কোন একটা চাকরি তার চাই।

অমিতের মতো চাকরি-খোঁজা ক্লান্ত অসহায় যুবকের সঙ্গে মল্লিক সাহেবের যোগাযোগটা হয়েছিল এইভাবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওঁদের শ্যামবাজারের বাড়িতে টুইশানের জন্য গিয়েছিল অমিত। মোট পাঁচজন ক্যাণ্ডিডেটের ভেতর থেকে তাকেই বেছে নিয়ে কাজটা দিয়েছিলেন মল্লিকসাহেব। তাঁর মেয়ে রুমী আর সোমাকে উইকে চারদিন পড়াতে হবে; মাইনে দেড়শো। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ওরা পড়ে—রুমী ইলেভেনে, সোমা টেনে।

প্রথম দু-তিন মাস মাইনে ঠিকমতোই পেয়েছে অমিত। কিন্তু যেদিন চাকরির জন্য মল্লিকসাহেবকে ধরল তার পরের মাস থেকেই

ওটা আর পাচ্ছে না। সে মুখচোরা লাজুক স্বভাবের ছেলে, টাকা-পয়সার কথা বলতে পারে না। তা ছাড়া মল্লিকসাহেব চাকরির বিষয়ে সোজাসুজি না বলেননি, বরং আশাই দিয়েছেন। বলেছেন সুযোগ হলেই অমিতকে তাঁদের কোম্পানিতে নিয়ে নেবেন। সেই সুযোগটা আর হয়ে উঠছিল না। তবে চাকরির আশাটা অমিতের নাকের সামনে এক টুকরো মাংসের মতো ঝুলিয়েই রেখেছিলেন। আজ না কাল, এ-মাসে এই অসুবিধা, ও মাসে এই ট্রাবল, আশা করি সামনের মাসে একটা কিছু হয়ে যাবে—এই করে করে অমিতকে ক্রমাগত ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অমিতও ভাবছিল, টুইশানের টাকা না পেলেও, যদি একটা চাকরি জুটে যায়, সব ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে! শেষ পর্যন্ত মল্লিকসাহেব আজ তাকে দেখা করতে বললেন। দেখা যাক, কি হয়।

ছুটির দিন, রাস্তা ফাঁকাই ছিল। অমিতের অঙ্কগুলো তাই মিলে গেল। এগারোটা বাজবার দশ মিনিট আগে সাদার্ন এ্যাভেনিউতে বারোতলা ঝকঝকে নতুন এপার্টমেন্ট হাউসটার নিচে এসে দাঁড়াল সে। এরই টপ ফ্লোরে মল্লিক সাহেবের প্রকাণ্ড ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট।

ভেতরে ঢুকেই বাঁ দিকে লিফট বক্স। অমিত কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সেদিকে গেল না। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত একবার দেখে নিল। মল্লিকসাহেব চাকরি সম্বন্ধে নিশ্চিত-ভাবে আজ কিছু বলবেন। তিনি ভরসা দিয়েছেন, খবরটা তার পক্ষে শুভই হবে। তবু ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিল অমিত। ছেলেবেলায় কঠিন কঠিন অসুখে অনেকদিন ভুগেছে সে, তার স্নায়ুগুলো এমনিতেই খুব দুর্বল। এখন এই জানুয়ারি মাসে কলকাতার আকাশে অকালের মেঘ, উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, ঠাণ্ডায় শরীর কুঁকড়ে যাবার কথা। কিন্তু অমিত গলগল

করে ঘামতে লাগল। সে অনুভব করল, পুলওভারের তলায় জামাটা ভিজে যাচ্ছে। ভয়, উত্তেজনা, এমন কি আনন্দও—এসব প্রবল হলে তার কমজোরী নার্ভ সহ্য করতে পারে না।

দু-তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে জোরে শ্বাস টানল অমিত। তারপর এলোমেলো পা ফেলে লিফট বক্সে ঢুকে টপ ফ্লোরের বোতাম টিপল। অটোমেটিক লিফটটা এক পলকে হাউইর মতো তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে এল। বক্স থেকে বেরিয়েই ডানধারে মল্লিক সাহেবের ফ্ল্যাট। অমিত এগিয়ে গিয়ে কলিং বেলে শিথিল-ভাবে চাপ দিল। তার হৃদ্‌পিণ্ডে এখন ঝড়ের মতো কিছু বয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদেই দরজা খুলে যে সামনাসামনি দাঁড়াল তার নাম স্টিফেন। লোকটা কেরালার কৃশ্চান, রোমান ক্যাথলিক, গলায় কালো কারে রুপোর ক্রশ। চল্লিশ বেয়াল্লিশের মতো বয়স তার, শক্ত মজবুত শরীর, গায়ের রং কুচকুচে কালো, নীগ্রোদের মতো চুল—ইংরেজিতে একেই বোধ হয় 'বুশি হেয়ার' বলে। স্টিফেন মল্লিক সাহেবের এই ফ্ল্যাটে বয়-কাম-কুক।

এখানে আগেও তিন চার বার এসেছে অমিত। দু-জনেই দু-জনকে চেনে। কাঁপা আধফোটা গলায় অমিত জিজ্ঞেস করল, 'সাহেব আছেন?'

ভুলভাল ইংরেজির সঙ্গে কিছু বাংলা পাঞ্চ করে কথা বলে স্টিফেন। দাঁত বার করে ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিল সে, 'ইয় ওয়েটিং ফর ইউ। বাঁ দিকের রুমে, ডিভানে লাইং। গো—'

স্টিফেনের দাঁতগুলো হারামোনিয়ামের রিডের কথা মনে করি দেয়। এখন তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। অমিত ফ্ল্যা ভেতর ঢুকে বাঁ ধারে ঘুরতে যাবে, হঠাৎ কি মনে পড়ে বেজে বা ভাবে স্টিফেন বলে উঠল, 'ওয়েট মিস্টার, ওয়েট—'

'কী হল?' অমিত অবাক হল, একটু বিরক্তও।

চোখ টিপে অর্থপূর্ণ মজার ভঙ্গি করল স্টিফেন। তারপর কাণ্ডমাথায় কাছে মুখ এনে ষড়যন্ত্রকারীর মতো চাপা গলায় বলল, 'সুফিয়া লুরেন—'

অমিত বুঝতে পারল, সোফিয়া লোরেনের কথা বলছে স্টিফেন। লোকটা ফাঁক পেলেই ইংরেজি ছবি ছ্যাখে। সমুদ্রপারের যত লোভনীয় মোহময়ী ফিল্মস্টাব সর্বক্ষণ তার মাথাব ভেতর গিজগিজ করতে থাকে। সে হাঁ কবলে আলজিভেব তলা থেকে ঝাঁক ঝাঁক চিত্রতারকার নাম বেরিয়ে আসে।

অমিত বিমঢ়েব মতো জানতে চাইল, 'সোফিয়া লোরেন কি করেছে?

'এসেছে।'

'কোথায়?'

'সাহেবের রুমে। একজ্যাক্ট সুফিয়া লুবেন। কাল নাইটে সাহেব নিয়ে এসেছিল, এখনও যায় নি। আনন্দ—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?' হেঃ-হেঃ-হেঃ—টেনে টেনে হাসিটাকে অনেকখানি লম্বা করে স্টিফেন আগের মতো গলায় বলে যেতে লাগল, 'হী এনজয়িং লাইফ— আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

মল্লিক সাহেব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই অমিতের। তবে আবছাভাবে সে শুনেছে লোকটা ঠিক ধোয়া তুলসীপাতা না। বাড়িতে স্ত্রী আছে, বয়সেও পঞ্চাশ পেবিয়েছে, তবু অন্য মেয়ে সম্পর্কে মল্লিক সাহেবের প্রচণ্ড দুর্বলতা, বাইবের মেয়েদেব শরীর তিনি পয়সা দিয়ে নাকি কিনে থাকেন। তাই বলে রাত কাটাবার জন্য কাউকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসবেন এতটা ভাবা যায়নি। চার পাঁচ বার এখানে এসেছে অমিত, আগে স্টিফেন এ ব্যাপাবে তাকে কিছুই বলে নি, আজ কেন বলল সে-ই জানে। অমিত নিজের কমজোরী শীর্ণ নার্ভে হঠাৎ ধাক্কা অনুভব করল। তারপর ভাবল, যাক গে, আমার কি। আমাব চাকরি হওয়া নিয়ে কথা।

কা স্টিফেন আবার বলল, 'তিনদিন আগে ইলজাবাথ টিলরকে এনে-ছিল সাহেব।'

অর্থাৎ এলিজাবেথ টেলরের মতো দেখতে কোন মেয়ে, অন্তত স্টিফেনেব চোখে। অমিত কিছু বলল না।

স্টিফেন বলে যেতে লাগল, 'আমাব সাহেব পরীর মার্কিট বসিয়ে দিচ্ছে। হী—টেবিফিক।' তার গলার স্বর একই পর্দায় বাঁধা, তাতে কোন উত্থানপতন নেই।

অনেকক্ষণ একটানা বকবাব পর হঠাৎ স্টিফেনের চোখে পড়ল, অমিত তার কথা তেমন শুনছে না। আচমকা ব্রেক কষার মতো সে থেমে গেল। তারপব বলল, 'এক মিনিট মিস্টার। আমি সাহেবকে আপনার কথা বলে আসছি।' স্টিফেন চলে গেল। আগে থেকে না জানিয়ে ঘবে ঢুকলে মল্লিক সাহেব ক্ষেপে যেতে পারেন, তাই স্টিফেনেব এই সতর্কতা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিবে এসে সে বলল, 'নাউ গো—'

বাঁ দিকে ঘুরে মল্লিক সাহেবের ঘরের সামনে অমিত যখন পৌঁছুল তাব মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু চলছে। আগেও যখন চাকরির খবব নিতে মল্লিকসাহেবের কাছে এসেছে, এই বিপর্যয়টা হয়েছে। যত বার আসবে তত বারই হবে। সেই উইক নার্ভ।

উল্টোপাল্টা প্রবল বাতাসে দরজার নীলাভ দামী পর্দা উড়ছিল। তার ফাঁক দিয়ে মল্লিকসাহেব হয়তো অমিতকে দেখতে পেয়েছিলেন। গম্ভীর ভারী গলায় বললেন, 'কাম ইন—'

অমিত ঘবে ঢুকে নিজেকে গুটিয়ে এতটুকু করে দাঁড়াল। টাইলস-বসানো মেঝে দামী নীল কার্পেটে মোড়া। ডিসটেম্পার-করা দেওয়াল। জানলায় নকশা-করা সুদৃশ্য গ্রিল। মাটি থেকে দেড়শো ফুট উঁচুতে এই ফ্ল্যাট। সামনের দিকটা একেবারে ফাঁকা আর অবাধ; এখন থেকে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত বিশাল আকাশ

দেখা যায়। মল্লিকসাহেবের এই ফ্ল্যাটে না এলে কলকাতার মাথায় এত বড় আকাশের চাঁদোয়া খাটানো আছে, ভাবা যেত না। নিচে কালো ফিতের মতো টু-ওয়ে সাদার্ণ এ্যাভেনিউ; তার মাঝখানে সবুজ ঘাসের আইল্যাণ্ড। রাস্তার ওপারে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, তারপর শীতের শান্ত লেক, রোয়িং ক্লাব, এসব ছাড়িয়ে বজবজ যাবার রেল লাইন। ডানদিকে দূরে উঁচু উঁচু নতুন বাড়িগুলোর মাথায় আঁকাবাঁকা আকাশরেখা।

মল্লিকসাহেবের এই ঘরটা চমৎকার সাজানো। এক ধারে জানালা ঘেঁষে ডিভান, মাঝখানে সোফা সেণ্টার টেবল। আরেক ধারে ক্যাবিনেটের ভেতর নানা আকারের অগুনতি মদের বোতল, বেশির ভাগই অবশ্য ফাঁকা। শূন্য বোতলগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি; সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওদিকে তাকালে মনে হয় এটা যেন মদের বোতলের কিউরিও শপ। এক দেওয়ালে জুটের ওয়াল-ক্যালেণ্ডার, আরেক দেওয়ালে ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি।

মল্লিকসাহেব দশ বারোটা ফোমের বালিশে কোনটায় পা কোনটায় উরু কোনটায় হাত চাপিয়ে ডিভানের ওপর শুয়ে ছিলেন। বললেন, 'বোসো—'

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল অমিত; একটা সোফায় ঝুপ করে নিজের শরীরটা ছেড়ে দিল।

সেণ্টার টেবলের ওপর একটা অটোমেটিক জাপানী রিস্টওয়াচ পড়ে ছিল। ঘাড় তুলে একপলক দেখে নিয়ে মল্লিকসাহেব বললেন, 'ইলেভেন শার্প। তোমার সময় জ্ঞান ভাল; নাইনটি পারসেণ্ট লোকের থাকে না।' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে ঢিলেঢালা ব্যস্ততাহীনভাবে উঠে বসলেন।

মল্লিকসাহেবের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন; তবে অতটা দেখায় না, খুব বেশি হলে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ মনে হয়। প্রায় ছ ফুটের মতো হাইট; মোটা মোটা শক্ত হাড়ের ফ্রেমে তাঁর দৃঢ় মজবুত শরীর।

মোটা মোটা আঙুল, ভারী ছড়ানো চোয়াল, মাংসল কাঁধ। বৃষস্কন্ধ বলতে যা বোঝা যায় তিনি তা-ই। দেখেই টের পাওয়া যায় প্রচুর শক্তি আর এনার্জি এই মানুষটির মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সামনের দিকের কিছু চুল পাতলা হয়ে এসেছে, ফলে কপালটা চওড়া দেখায়।

মল্লিকসাহেবের গায়ের রং হলদে; চোখ চাপা, ঠোঁট পুরু, নাক চ্যাপ্টামতো। খানিকটা মোঙ্গলীয় রক্ত কিভাবে যেন তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখন তাঁর পরনে স্ট্রাইপ-দেওয়া ঢোলা পাজামা আর হাউসকোট।

মল্লিকসাহেব বাইরে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ওয়েদারটা আজ ভীষণ খারাপ। শীতকালে এই ক্লাউডি আবহাওয়া ভারি বিশ্রী; আই ডিসলাইক ভেরি মাচ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'শীতে ব্রাইট গোল্ডেন রোদ না থাকলে আমার ভাল লাগে না। সকাল থেকে মেঘ—বট!' মল্লিকসাহেবকে বিরক্ত দেখাল; তাঁর চোখের তলায় এবং কপালে ভাঁজ পড়েছে।

অমিত অস্বস্তি বোধ করল। আকাশের বিশাল শরীর থেকে অকালের মেঘ ঠেলে সরিয়ে মল্লিকসাহেবের জন্য ঝলমলে সোনালী সূর্যরশ্মি বার করে আনার ক্ষমতা তার নেই। সে যে এখন কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে পেল না। উদ্বিগ্নভাবে মল্লিকসাহেবের দিকে তাকাল শুধু। সেই স্নায়ুভীতি।

মল্লিকসাহেব বললেন, 'তোমার এই ওয়েদার ভাল লাগে?'

অমিত তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়াল, অর্থাৎ ভাল লাগে না।

মল্লিকসাহেব বলতে লাগলেন, 'মনে হয় এরকম ওয়েদারে হাড়ে রাস্ট ধরে যায়। এনিওয়ে তোমার ছাত্রীদের খবর কী?'

নিজের দুই মেয়ে রুমী আর সোমার কথা জিজ্ঞেস করছেন মল্লিকসাহেব। চট করে আরেক বার অমিতের মনে পড়ে গেল, আট ন'মাস মাইনে পায় নি। যাক গে, চাকরিটা হয়ে গেলে সে শোক

সে ভুলতে পারবে।. অমিত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ভাল, দু-জনেই স্ট্যাণ্ড করবে।'

'ফাইন। তোমার হাতে মেয়ে দুটোকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি।'

'আমি স্যার দায়িত্ব নিয়েই ওদের পড়াচ্ছি।'

'আই নো, আই নো। লোক চিনতে আমার ভুল হয় না।''

একটু চুপচাপ।

তারপর মল্লিকসাহেবই আবার বলে উঠলেন, 'বল, এখন কী খাবে?'

শীতকালে বাদল দিনের আবহাওয়া, মেয়েদের পড়াশোনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলছেন ভদ্রলোক; শুধু তার চাকরির প্রসঙ্গটাই উঠছে না। অমিত জানালো সে কিছু খাবে না।

'ও নো; এর আগেও তিন চারিদিন এসেছ, কিছু খাও নি। দ্যাটস ব্যাড, আজ ক্লাউডি আবহাওয়া, একটু হুইস্কি খাও—ইউ উইল ফীল ফাইন—'

এটা ঠিক, এখানে যত বারই এসেছে মল্লিকসাহেব তাকে ড্রিংক অফার করেছেন। অমিত খায় নি। অন্যান্য বারের মতো আজও হুইস্কির কথায় তার মেরুদণ্ড বেঁকে দুমড়ে গেল। ক্ষীণ কাঁপা গলায় সে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন স্যার—'

মল্লিকসাহেব তাকে সাহসী করে তুলতে চাইলেন, 'বী ব্রেভ মাই বয়—'

'আমাকে ক্ষমা করুন স্যার—'

'হোয়াটস রং ইন হুইস্কি?'

'আমি স্ট্যাণ্ড করিতে পারি না।'

'আই সী, আই সী, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি পাপটাপের কথা চিন্তা করছ।"

'না স্যার—'

'ছাটস গুড। এটা একটা ইণ্ডাস্ট্রি; তুমি আমি কেউ যদি হুইস্কিটা না খাই, হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যাবে। ইটস ইনহিউম্যান। যাক গে, তুমি একটু বীয়ারই খাও, খুব মাইল্ড ব্যাপার—'

মাঝে মাঝে শখ করে এক-আধটা সিগারেট খেয়ে থাকে অমিত। হুইস্কি-টুইস্কি কখনই না। তার মানে এই নয় যে মদ্যপান ব্যাপারটা সম্বন্ধে অমিতের অহেতুক বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা আছে। আসলে ওটা খাবার মতো পয়সা তার নেই। দ্বিতীয়ত, তার ধারণা, খেলে সহ্য করতে পারবে না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে অমিত বলল, 'আমার কনস্টিটিউসান খুব উইক স্যার।'

মল্লিকসাহেব হাতদুটো উল্টে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন, 'তা হলে আর কী করা যাবে। তুমি বিশুদ্ধ পবিত্র চা-ই সেবন কর।' স্টিফেনকে ডেকে অমিতের জন্য চা এবং তাঁর নিজের জন্য বীয়ার দিতে বললেন।

একটু বাদেই বীয়ার-টীয়ার এসে গেল। খেতে খেতে হঠাৎ বীয়ারের হেক্সাগোনাল ঢাউস গেলাসটা মুখ থেকে নামালেন মল্লিক-সাহেব। হাতের ভেতর সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'তুমি হয়তো আমার সম্বন্ধে ভাবছ, লোকটা এই দুপুরবেলাতেই মদ্যপান শুরু করলে। ইন ফ্যাক্ট অমিত মদটা আমি খাই এনার্জির জন্যে—নো আদার রিজন। হোল ডে ফ্যাক্টরিতে যা খাটতে হয় আর তাতে যে এনার্জি নষ্ট হয় সেটা তো রিগেইন করতে হবে। এনার্জি লস্ট ইকোয়েল টু এনার্জি গেইনড—এটা না হলে তো বাঁচা যায় না।'

চা খেতে খেতে অপরিষ্কার গলায় অমিত বলল, 'আজ্ঞে—'

'ছাটস হোয়াট আই হ্যাভ টু টেক ড্রিংকস। না হলে এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে মদ্যপানটা তো কাজের কথা নয়—'

এই সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। স্টিফেন টেলিফোনটা খুলে এনে এ ঘরের দেয়ালের একটা পয়েন্টে প্লাগ গুঁজে রিসিভারটা

মল্লিকসাহেবের হাতে দিল। মল্লিকসাহেব সেটা কানে লাগিয়ে কথা বলতে লাগলেন, 'হ্যালো, হিয়ার ইজ মালিক—' মল্লিকটাকে তিনি জিভ এবং টাকরা সহযোগে কায়দা করে 'মালিক' উচ্চারণ করেন।

অমিত লক্ষ্য করল, মল্লিকসাহেব লাইনের অন্য প্রান্তে অদৃশ্য ব্যক্তিটির সঙ্গে তাঁদের ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আলোচনা করছেন। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেরামিকের অত্যন্ত দামী সুন্দর কাপটি খুব আলতো করে সেণ্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল সে।

অমিত শুনেছে, কাজের সুবিধার জন্য সাদার্ন এ্যাভেনিউর এই ঝকঝকে ফ্ল্যাটটা কিনেছেন মল্লিকসাহেব। তাঁর ফ্যাক্টরি হাইড রোডে, বাড়ি শ্যামবাজারে। এত দূর থেকে প্রতিদিন যাতায়াত প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কলকাতা শহরে ইনডিপেনডেন্সের পর কর্পোরেশন এক সেন্টিমিটারও নতুন রাস্তা তৈরি করেনি; অথচ বছর বছর পাঁচ সাত হাজার করে নতুন গাড়ি বেড়ে যাচ্ছে। ফলে এক মিনিট যেতে না যেতেই ট্র্যাফিক জ্যাম। যে ক'টা পুরনো রাস্তা আছে খানাখন্দে বোঝাই; বোমা পড়লে যে রকম হয় চারদিকে তেমনি গর্তটর্ত হয়ে আছে—একেবারে যুদ্ধকালীন অবস্থা যেন। ওগুলোর দুধারে গারবেজের পাহাড়, এছাড়া মিছিল, ভিখিরি-দালাল-বেশ্যা-হকারের ভিড়। কলকাতার রাস্তায় হর্স পাওয়ার যতই থাক, কোন গাড়িতেই দশ মাইলের বেশি স্পীড তোলা যায় না। যেভাবে চলেছে, কলকাতা গো-গাড়ির যুগে চলে গেল বলে। তার ওপর বর্ষায় এই শহর তিন ফুট জলের তলায় ডুবে থাকে। অবস্থাটা যখন এই রকম, শ্যামবাজার থেকে হাইড রোডে একবার গিয়ে ফিরে আসতে দু-তিন ঘণ্টা সময় বাজে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ আজকের ওয়ার্ল্ডে কে না জানে টাইম ইজ মাণি। তা ছাড়া মল্লিকসাহেবের কাজ ফ্যাক্টরি আওয়ার্সের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। চার হাজার

ওয়ার্কারের যাবতীয় দায়িত্ব এবং দুশ্চিন্তা তার মাথার ওপর তিরিশ টন ওজনের মতো চেপে আছে। ফ্যাক্টরির সমস্ত টেনসান স্তূপাকার ফাইলের ভেতর পুরে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়। ট্র্যাফিক, মিছিল এবং রাস্তার নানা জট ছাড়িয়ে যাওয়া-আসা করতে করতে স্নায়ুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে। ব্লাডপ্রেসার এমন একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে যায়, যাতে বাড়ি ফিরে আর কিছু করার মতো মেজাজ থাকে না। শ্যামবাজারের বাড়িতে লোকজন হৈ-চৈ খুব বেশি ; দারুণ ডিসটারব্যান্স ; কাজ করার মতো পরিবেশ নয়। বস্তুত, সব দিক বিবেচনা করে সাদার্ন এ্যাভেনিউর এই বারো তলার এ্যাপার্টমেণ্টটা কিনেছেন মল্লিকসাহেব। সমস্ত দিক থেকেই এটা সুবিধাজনক। প্রথমত তাঁর ফ্যাক্টরি এখান থেকে বেশ কাছে। তা ছাড়া সাউথ ক্যালকাটার এই অংশটা এখনও ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে নি, গিজগিজে ভিড়ও নেই। কাজকর্মের পক্ষে আইডিয়াল এনভায়রনমেণ্ট। সপ্তাহে ছ'দিন এখানে থাকেন মল্লিকসাহেব, বাকি দিনটা শ্যামবাজারে ফ্যামিলি লাইফের আস্বাদ নিতে যান। সেখানে বিশাল পৈতৃক বাড়িতে স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা আছে। ওদের তিনি এই ফ্ল্যাটে আনেন না।

মল্লিকসাহেব মোটা স্বরহীন যান্ত্রিক গলায় এখন টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর ভারী মাংসল কাঁধের ওপর দিয়ে ডান ধারের জানালার বাইরে তাকাল অমিত। ওদিকটায় ব্যালকনি। স্টেডিয়ামের দিকে মুখ করে একটি মেয়ে সেখানে বসে আছে। সে বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী বা সিন্ধী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার বয়েসটা মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে—সাতাশ-আটাশের মতো। আদিবাসী মেয়েদের মতো উদ্দাম বুনো স্বাস্থ্য তার। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে একটা কথাই মনে পড়ে যায়—তার নাম সেক্স। এই তা হলে স্টিফেনের সুফিয়া লুরেন।

কিছুক্ষণ আগে মল্লিকসাহেব এনার্জির কথা বলছিলেন। নানা

আকারের দেশী-বিদেশী মদের বোতল থেকেই শুধু না, মেয়েদের শরীর থেকেও তিনি এনার্জিটা সংগ্রহ করে থাকেন।

মল্লিকসাহেবের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। টেলিফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে লম্বা চুমুকে অনেকটা বীয়ার খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ওই দেখ, তোমাকে যে জন্য আজ আসতে বলেছি সেটাই এখনও বলা হয় নি। বিকামিং ভেরি মাচ ফরগেটফুল।'

মল্লিকসাহেব কিসের সম্বন্ধে বলছেন, অমিত বুঝতে পারল। অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে সে তার দিকে তাকাল। অমিত টের পাচ্ছিল, আবার গলগল করে সে ঘামতে শুরু করেছে।

বীয়ারের গেলাসটা তখনকার মতো হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে মল্লিকসাহেব বললেন, 'আই এ্যাম এক্সট্রিমলি সরি অমিত, এবারও কিছু করা গেল না।' তাঁর মুখে দুঃখের কটি রেখা আবছা-ভাবে ফুটেই মিলিয়ে যেতে লাগল।

অমিতের হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে একটা শক্ত ডেলার মতো আটকে গেল যেন। শ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল তার। এর আগেও চার বার মল্লিকসাহেব তাকে চাকরির আশা দিয়েছেন এবং চার বারই শেষ পর্যন্ত দুঃখিত গলায় বলেছেন, 'অ্যাই এ্যাম সরি।' এবার কেন যেন অমিতের বিশ্বাস হয়েছিল, বেশ জোরালো বিশ্বাস—চাকরিটা হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। মল্লিকসাহেব লোকটা কি স্যাডিস্ট? তাকে কষ্ট দিয়ে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছেন? শ্বাসকষ্টের রুগীর মতো অসুস্থ গলায় অমিত প্রতিধ্বনি করল 'এবারও হল না!'

স্টম্যাকে অনেকখানি বীয়ার ঢুকে গিয়েছিল। গরম লু-বাতাসের মতো ঝোড়ো নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ালেন মল্লিক-সাহেব। বললেন, 'কি করে হবে। ওয়ার্কাররা পরশু স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। এই টারময়েলের মধ্যে নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না।'

অমিতের একবার ইচ্ছা হল—বলে, 'দিনের পর দিন আপনি আমাকে ঘোরাচ্ছেন। স্ট্রাইক হোক আর যাই হোক কোন টালবাহানা শুনতে চাই না, চাকরিটা আমাকে দিতেই হবে। নাকের ডগায় চাকরির আশা ঝুলিয়ে রেখে শালা তুমি বিনে পয়সায় মেয়েদের পড়িয়ে নিচ্ছ। তোমার খচরামো আমি বুঝি।' ভাবল বটে, কিন্তু বলতে পারল না। মেজো ভাই বা ছোট ভাই সান্টুর মতো সে সাহসী উদ্ধত কিংবা গোঁয়ার নয়। অমিত ভীরু, তার নার্ভ দুর্বল, ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপের মতো ঘাড় গুঁজে সে বসে থাকল।

গম্ভীর সহানুভূতির গলায় মল্লিকসাহেব এবার বললেন, 'ডোণ্ট ওরি, আমি ঠিক লেগে থাকব। স্ট্রাইকটা মিটে যাক, তারপর একটা অপারচুন মোমেণ্ট এলেই তোমাকে ঢুকিয়ে নিচ্ছি।'

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে অমিত নড়বড়ে পায়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি যাচ্ছি—'

'ও কে, আবার দেখা হবে

॥ তিন ॥

দেড় শো ফুট উচ্চতা থেকে লিফটে করে কখন রাস্তায় নেমে এসেছে অমিত, কখন সদার্ন এ্যাভেনিউ থেকে ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়েছে খেয়াল নেই। নিজেকে ডিফিটিস্ট মনে হচ্ছিল তার —ক্লান্ত এবং পরাজিত। কখনও কখনও গভীর রাতে, নির্জন দুপুরে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। সেই প্রবণতাটা এই মুহূর্তে তাকে চারপাশ থেকে যেন ঘিরে ধরছিল। তার মধ্যেই অমিত ভাবল, মল্লিকসাহেবের মেয়েদের আর পড়াবে না।

একটা ছোট সরু রাস্তা ল্যান্সডাউন রোড থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে ওধারের ফুটপাথে আসতেই আচমকা অনেকদিন বাদে সতীকে দেখতে পেল অমিত। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের মসৃণ ডানা থেকে জলকণা ঝরে পড়ার মতো হতাশা, ক্লান্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা নিমেষে মুছে গেল যেন।

এখন বারোটার মতো বাজে। সামনের বড় গানের স্কুলটায় এই মাত্র ছুটি হয়েছে। ঝাঁক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতি হয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসছিল। সতী তাদের মধ্যেই রয়েছে, তার হাতে সাটিনের কভার দেওয়া তানপুরা। কোথায় কোন জরুরি দরকারে এসেছিল, কোথায় যাচ্ছে, মুহূর্তে এসব ভুলে গিয়ে ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল অমিত।

অমিতের সামনের রাস্তাটা, যার নাম রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, মেরুদণ্ড টান টান রেখে সোজা গড়িয়াহাটার দিকে চলে গেছে। উল্টোদিকে কোণাকুণি দেশপ্রিয় পার্ক। যে ল্যান্সডাউন রোডের ওপর অমিত দাঁড়িয়ে আছে সেটা ওধার থেকে রাসবি[illegible]কে সমকোণে কেটে লেকের দিকে ছুটেছে।

এই ছুটির দিনেও বাসস্ট্যাণ্ডে, ট্রাম স্টপেজে থোক থোক মানুষের

ভিড়, তবে সপ্তাহের অন্য সব দিনের তুলনায় এ ভিড় কিছুই না। ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা ট্রাম কি ডবল ডেকার পোকার মতো বুকে হেঁটে হেঁটে স্টপেজগুলোতে এসেই ছোঁ মেরে মানুষ-জন তুলে নিয়েই উধাও হচ্ছে। ওধারের একটা রেস্তোরাঁর সামনের ফুটপাথে ক'টি যুবক, চেহারা এবং পোশাক মড-দের মতো চওড়া জুলপি, বড় চুল, পরনে বেলবটস, হাতে ঢলঢলে স্টীল ব্যাণ্ডে ঢাউস ঘড়ি—দারুণ চিৎকার করে কোন বিষয়ে আলোচনা করছিল। বিষয়টা যা কিছু হতে পারে—পলিটিকস, রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায়, সেক্স, সাহিত্য, পপ মিউজিক, কলকাতার প্রস্টিটিউট—এনিথিং।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, ছুটির দিনের ঢিলেঢালা হাত-পা-ছড়ানো ভাব। ট্রাম-বাস-ট্যাকসি-প্রাইভেট কার বা মানুষ, সব কিছু সারা গায়ে আলস্যের মেজাজ মেখে চলছে ফিরছে।

মাথার ওপর আকাশের ভারী কালো মেঘ, রাসবিহারীর ঋজু রেখা, যুবকদলের চিৎকার, দেশপ্রিয় পার্কের চিকন সবুজ ঘাস—কোনদিকেই দেখছিল না অমিত, একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন সতীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

অনেক, অনেক কাল পর সতীকে দেখল অমিত। কম করে চার-পাঁচ বছর বাদে। এই ক' বছরে অনেক সুন্দর হয়েছে সতী, অনেক আকর্ষণীয়। প্রজাপতির ঝাঁকে মিশে থাকলেও আর সবার থেকে সে যেন আলাদা, অন্য সবার চাইতে উজ্জ্বল।

এখন কত বয়স হবে সতীর? তেইশ-চব্বিশের বেশি কিছুতেই না। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় সে বেশ লম্বাই, তবে ঢ্যাঙা নয়। গায়ের রং পাকা গমের মতো। ভরাট টান টান শরীরে কোমল মসৃণ ত্বক তার, মুখটা পানপাতার মতো, সরু চিবুকের তলায় মনোরম একটা খাঁজ। কালো পালকে ঘেরা টানা চোখ, ছোট্ট কপাল, রাজহাঁসের মতো গলা, পাতলা নাক, একবেণী-করা চুল, পাতলা রক্তাভ ঠোঁট।

একটা তাঁতের শাড়ি সতীর পরনে, শাড়িটার জমি ধবধবে সাদা ; ধারে সোনালি জরির চওড়া পাড়। ঘি রঙের কারুকার্যময় কাশ্মীরী শাল তার ওপর আলতো করে জড়ানো। বাঁ হাতে ছোট্ট গোল ঘড়ি, ডান হতে নক্‌শা-করা সোনার রুলি। কানে গোল ইয়ার-রিং, বাঁ হাতের আঙুলে লম্বাটে রক্তবর্ণ পাথরের আংটি। কপালে গুঁড়ো চন্দনের বড় গোল টিপ।

অমিত ভাবল সে কি এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে ? সতী যদি চিনতে না পারে ? দুর্বল নার্ভ নিয়ে সে দাঁড়িয়েই থাকল।

গানের স্কুলের মেয়েরা চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ট্রাম স্টপেজ আর বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল, বাদ বাকি সবাই এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে লাগল। সতী ট্রাম লাইনের দিকে যেতে গিয়ে কি ভেবে এ ধারে ফিরেছিল, তখনই অমিতের সঙ্গে চোখচোখি হয়ে গেল। এক পলক তাকিয়ে থাকল সতী। তার-পর আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'অমিতদা না ?' বাঁশির সুরের মতো তার গলা। বলেই হাসল সতী।

হাসলে দারুণ পবিত্র দেখায় সতীকে। গালে গভীর টোল পড়ে। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে দিল অমিত।

সতী আবার বলল, 'কতকাল পর আপনাকে দেখলাম।'

অমিত হাসল।

'ক' বছর বাদে বলুন তো ?'

'চার-পাঁচ বছর নিশ্চয়ই।'

সতী গাছপালা-আকাশ-নদী-মেঘদল ইত্যাদি মিলিয়ে যে প্রকৃতি তার মতোই সহজ, স্বচ্ছন্দ। কোথাও তার এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। বলল, 'আপনি, কিন্তু একই রকম আছেন অমিতদা, চেহারা একটুও বদলান নি। দেখেই চিনতে পেরেছি।'

অমিতের বলতে ইচ্ছে হল, তুমি কিন্তু আগের মতো নেই সতী,

অনেক সুন্দর হয়েছ। সাহসের অভাবে কথাটা বলা গেল না। সে শুধু বলল, 'তাই নাকি।'

সতী একটু ভেবে বলল, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

'সাদার্ন এ্যাভেনিউতে একটা কাজ ছিল।'

'এখন কোথায় যাবেন?'

'বাড়ি ফিরছিলাম।' বলে একটু থামল অমিত। যদিও চার-পাঁচ বছর আগে সতীকে 'তুমি' করেই বলত, এখন বলবে কিনা, বললে সতী কিছু মনে করবে কিনা ইত্যাদি দ্রুত ভেবে নিয়ে অগাধ জলে ঝাঁপ দেবার মতো সে বলল, 'তোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম।'

সতী বলল, 'আপনারা রানীবাজারে থাকতেন না? সেখানেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আজকাল আমাদের বাড়ি আসেন না কেন?'

স্পষ্ট করে কোন উত্তর দিতে পারল না অমিত। এলোমেলো ভাবে বলল, 'মানে, এই—'

সতী বলল, 'মা-বাবা, বাড়ির সবাই আপনার কথা খুব বলে। সেদিনও মা দাদাকে বলছিল আপনাকে দেখতে পেলে যেন বাড়িতে নিয়ে আসে। আমাকেও বলেছিল।'

'ও আচ্ছা। মাসিমা মেসোমশাই কেমন আছেন?'

'বাবার ডায়বেটিস, হাই ব্লাড সুগার। মা'র একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে; অবশ্য মাইল্ড। এই সব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।'

'আর জ্যোতির্ময়?

জ্যোতির্ময় সতীর দাদা, দশ-বারো বছর আগে বঙ্গবাসীতে অমিতের সঙ্গে পড়ত। একই বছর তারা ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পাশ করেছিল। তারপর ব্রিটিশ ফার্মে ভাল চাকরি পেয়েছে। চার-পাঁচ বছর আগে অমিত খবর পেয়েছিল, জ্যোতির্ময়

ওদের কোম্পানির জুনিয়র গ্রেডের অফিসার হয়েছে। এতদিনে নিশ্চয়ই আরো উন্নতি হয়েছে। শুধু বি. এস-সি পাশ করলেই এমন একটা চাকরি জোটানো যায় না। জ্যোতির্ময়ের এক মেসো নামকরা এক চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারী, পশ্চিম বাংলার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সার্কেলে তাঁর দরুণ ইনফ্লুয়েন্স। জ্যোতির্ময়ের চাকরিটা তাঁর জন্যই হয়েছে। আর অমিত বি. এস-সি পাশ করার পর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ডালহৌসির কয়েক হাজার অফিস আর মল্লিকসাহেবের মতো লোকেদের কাছে ঘুরে ঘুরে এ ক'বছরে হাঁটুর হাড় আলগা করে ফেলেছে। ইণ্টারভিউ-টিণ্টারভিউ সে অনেক পেয়েছে। কিন্তু চাকরি হয় নি। জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচুদরের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মেসো তার নেই।

কলেজে পড়ার সময় জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ওদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে প্রায়ই আসত অমিত, বি. এস-সি পাশ করার পরও বার কয়েক এসেছে। জ্যোতির্ময় যখন ব্রিটিশ ফার্মে চাকরিটা পেয়ে গেল, তারপর থেকে আর আসে না। তখন থেকেই তার মনে হচ্ছিল হেরে যাচ্ছে—সে ডিফিটিস্ট। পৃথিবীতে তার প্রয়োজন নেই। একই সঙ্গে পড়ত। জ্যোতির্ময় ছাত্র হিসেবে তার চাইতে অনেক খারাপ। অনার্সটা ছিল ঠিকই, তবে খুব কম নম্বর পেয়ে টায়টোয় পাশ করে গিয়েছিল। অথচ চমৎকার লোভনীয় একটা চাকরি সে পেয়ে গেছে, তার সামনে উজ্জ্বল সুখী ভবিষ্যৎ। আর অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েও এই নিষ্ঠুর কর্কশ উদাসীন শহরে ক্লান্ত পায়ে অচেনা আগন্তুকের মতো অমিত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সতী বলল, 'দাদার সঙ্গে আপনার কতদিন দেখা হয়নি অমিতদা ?'

অমিত বলল, 'অনেক দিন।'

'ওকে দেখলে এখন আর চিনতে পারবেন না।'

'তাই নাকি ?'

'দারুণ মোটা হয়ে গেছে। আগে যা দেখেছেন তার ডাবল। এই বয়সেই হাই ব্লাড প্রেসার ধরিয়ে ফেলেছে।'

'জ্যোতি কি ড্রিংক-ট্রংক করে ?' বলেই অমিতের মনে হল, এত সোজাসুজি এ কথাটা না বললেই বোধ হয় ভাল হত। কিন্তু এখন কি আর করা যাবে।

সতী বলল, 'ভীষণ। দাদার এ্যালকোহলিক ফ্যাট।'

অমিত ভাবতে চেষ্টা করল, জীবনে সাফল্যের সঙ্গে মদ্যপানের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা। সতী আবার বলে উঠল, 'জানেন দাদা বিয়ে করেছে।'

বিয়ের খবরটা তাকে দ্যায় নি জ্যোতির্ময়। অমিত নিজের মধ্যে নৈরাশ্য অনুভব করল, হয়তো ঈষৎ অভিমানও। অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'কবে ?'

'চাকরিতে ঢুকবাব এক বছব বাদে।'

'ও, আচ্ছা।'

সতী বলতে থাকে, 'দাদাব লাভ ম্যারেজ, আমার বৌদি সাউথ ইণ্ডিয়ান মেয়ে।'

অমিত সামান্য কৌতূহল বোধ করল, 'তাই নাকি—একেবারে ইণ্টারপ্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ।' বলে একটু হাসল।

সতীও হাসল। বলল, 'হ্যাঁ। একজন এ্যাসট্রোলজার দাদার হরোস্কোপ দেখে বলেছিল ও অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করবে।'

'খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার তো।'

'হ্যাঁ। উষারা আমাদের পাড়ায় থাকত। দাদার সঙ্গে আচারেলি আলাপ হয়েছে, আলাপ থেকে প্রেম, তারপর বিয়ে।'

অমিত বলল, 'জ্যোতিব বউয়ের নাম তা হলে উষা।'

সতী মাথা হেলিয়ে দিল, অর্থাৎ তা-ই। বলল, 'আপনি অবশ্য ওকে দেখলে বেঙ্গলী কি নন-বেঙ্গলী বুঝতে পারবেন না। আমাদের

মতোই বাংলা বলে। পলতার বড়া আর আলুপোস্ত খেতে খুব ভালবাসে।'

অমিত হেসে ফেলল।

সতী অনর্গল জ্যোতির্ময়ের আরো অনেক খবর দিয়ে যায়। চার বছরের বিবাহিত জীবনে ছুটো ছেলে হয়েছে তার, এখন সে প্রাউড ফাদার অফ টু কিডস। তবে স্ত্রী-ছেলে, বাবা-মা, কারো দিকে লক্ষ্য নেই তার; দিনরাত অফিস নিয়ে মেতে আছে—অনেকটা নেশা-গ্রস্তের মতো। জ্যোতির্ময়ের একটা প্রমোসান চাই। চাকরিতে বড় রকমের একটা লিফট, মাইনেতে কম করে আরো হাজার খানেক টাকার জাম্প—এ-সব না হলে তার চলছে না, ওই দিকে চোখ রেখে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। তবে সে যে-রকম একবোখা আর এ্যাম্বিশাস—উন্নতি করবেই। ইত্যাদি ইত্যাদি—

শুনতে শুনতে এক ধরনের ঈর্ষা অনুভব করছিল অমিত। সেই ডিফিটিস্ট ভাবটা তাকে যেন আবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরছিল। দ্রুত একবার আকাশের দিকে তাকাল সে, জলকণার ভারে মেঘেরা অনেকখানি নেমে এসেছে যেন। সে বলল, 'বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। তুমি এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

সতীও তাড়াতাড়ি একবার আকাশের চেহারাটা দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বাড়িই যাব।'

'চল, তোমাকে ট্রামে তুলে দিই।

ট্রাম-স্টপেজের দিকে যেতে যেতে অমিত বলল, 'তুমি এখন কী করছ? পড়াশোনা?'

সতী বলল, 'যাদবপুর ইউনিভার্সিতে নামটা লেখানো আছে, ক্লাস-ট্লাস করতে ভাল লাগে না। তবে গানটা শিখছি—ক্লাসিক্যাল ভোকাল মিউজিক।'

'কী সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছ?'

'ইংলিশ।'

'খুব ভাল, এই সাবজেক্টার এখনও ডিম্যাণ্ড আছে। পরীক্ষাটা দিয়ে দাও—'

সতী কিছু বলল না।

অমিত আবার বলল, 'মোটামুটি রেজাল্ট করতে পারলে ভালো ওপেনিং পেয়ে যাবে। আবে এসব কি বলছি। তোমার চাকরি-টাকরির কী দরকার।'

সতী হাসল। বলল, 'আমাব কথা থাক, আপনি কী করছেন বলুন—'

সে যে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া বেকার, একটা ওপেনিংএর খোঁজে দিনের পর দিন ছুটে বেড়াচ্ছে, এ কথাটা সতীকে বলা যায় না। আবছা গলায় সে শুধু বলল, 'তেমন কিছু না।'

পাশাপাশি যেতে যেতে দ্রুত এক পলক অমিতকে দেখে নিল সতী। কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর এ সম্পর্কে তার কোন প্রশ্ন না করে হঠাৎ বলল, 'গানটা ছাড়েন নি তো?'

আচমকা অমিতের মনে পড়ে যায়, কলেজে পড়বার সময় বেশ ভালই গাইত সে। তবে ক্লাসিক্যাল মিউজিক-টিউজিক নয়—রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গান আর আধুনিক। তাকে বাদ দিয়ে তাদের কলেজেব কোন এ্যানুয়েল সোশ্যাল হত না। ইণ্টারকলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিসনে দু-একবার প্রাইজও পেয়েছে অমিত। তখন জ্যোতির্ময়দের বাড়ি এলে সতী তাকে হারমোনিয়ামের সামনে জোর করে বসিয়ে দিত, কম করে পনের যোলটা গান না গাইলে ছাড়ত না। তারপর কবে থেকে গাওয়াটা সে ছেড়ে দিয়েছে মনেও পড়ে না। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ তাকে গান-টানের কথা বলেও নি।

আশ্চর্য, এই মেয়েটা—এই সতী তার সম্বন্ধে কত তুচ্ছ কথাই মনে করে রেখেছে! অমিতের বুকের ভেতর কিসের এক অনুভূতি

ছোট ছোট ঢেউ তুলে যায়। সে বলল, 'না, আজকাল আর গাই টাই না।'

'এত ভাল-গলা ছিল আপনার, গানটা ছেড়ে দিলেন!' সতীর সুন্দর নিষ্পাপ চোখে আন্তরিক দুঃখের ছায়া পড়ে।

অমিত বিষণ্ণ হাসল, 'কী করব!'

ওরা ট্রাম স্টপেজে এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সতী বলল, 'এখন আপনি কোথায় যাবেন?'

'বাড়ি ফিরব।'

'বাড়ি ফেরা কি খুব দরকার?'

'কেন বল তো?'

'এত কাছে এসেছেন, আমাদের বাড়ি একবার যাবেন না? জরুরি কাজ না থাকলে চলুন না। মা-বাবা দুজনেই খুব খুশী হবে।'

যাবে কি যাবে না, স্থির করতে পারছিল না অমিত। হুট করে এতদিন পর সতীর সঙ্গে ওদের বাড়ি যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা, বুঝতে পারছিল না। দ্বিধান্বিতের মতো অমিত দাঁড়িয়ে থাকল, তবে ভেতরে ভেতরে একটা দুর্দান্ত প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল।

সতী আবার বলল, 'গানের স্কুলে আসার সময় দাদাকে বাড়িতে দেখে এসেছি। ও যদি বেরিয়ে না যায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে। বৌদিকে তো আগে দ্যাখেননি, তার সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে।'

অমিত ভাবছিলই। বলল, 'আজ থাক, আরেক দিন যাব।'

নিষ্পাপ কিশোরীর মতো মুখ করে সতী বলল, 'কবে আসবেন বলুন—'

এই মেয়েটার মধ্যে কোথাও ন্যাকামি নেই। তার সব দিক স্বচ্ছ, সুন্দর আর পবিত্র। অমিত বলল, 'শিগগিরই একদিন আসছি।'

'দেখব।'

'দেখো!'

অমিত কী বলতে যাচ্ছিল। লেক মার্কেটের দিক থেকে দ্রুতগামী একটা ট্রাম হাওয়ায় ঝড় তুলে এসে গেল। সতী উঠে জানলার ধারে গিয়ে বসতেই ট্রামটা ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে সে বলল, 'আসবেন কিন্তু অমিতদা। আপনি এলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো উত্তুরে বাতাসে কী যেন বেজে যায়। মন্ত্র উচ্চারণের মতো গম্ভীব গলায় অমিত বলে, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব।' তারপর ডান হাতটা তুলে নাড়বার আগেই ইস্পাতের মসৃণ পাতের ওপব দিয়ে ট্রামটা দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়িয়ে, ওদিকের সিনেমা হল পেছনে ফেলে দূরে, আরো দূরে চলে যায়। স্তরে স্তরে সাজানো মেঘের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এইট-বি বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় অমিত। কিছুক্ষণ আগে মল্লিক-সাহেবের এ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে তার মনে হয়েছিল বেঁচে থাকার মানে হয় না। আত্মহত্যার সেই প্রবণতাটা তাকে পেয়ে বসেছিল ক্রমশঃ। বুক ভবে শীতের জলো হাওয়া টানতে টানতে আর আকাশের গায়ে মেঘেদের ধারে ধারে রুপোলি জরির নক্‌শা দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে তার মনে হতে লাগল এখনও বেঁচে থাকা যায়।

॥ চার ॥

একটু পরেই একটা এল-বাস এসে অমিতকে তুলে নিল। এই বাসটা শেয়ালদা হয়ে হাওড়া চলে যাবে। অমিত শেয়ালদার একটা টিকিট কাটল। কিন্তু শেয়ালদা পর্যন্ত গেল না। সার্কুলার রোডে এসে ছুম করে নেমে গেল। তারপব এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় এলোমেলো ঘুরতে লাগলো।

কলেজ ছাড়বার পর থেকেই অমিতের হাতে অনন্ত সময়। অবশ্য সপ্তাহে চার দিন সে মল্লিকসাহেবের মেয়েদের পড়াতে যায়। ওটুকু বাদ দিলে সাবা দিনে সময় কাটাবাব মতো কোন কাজ নেই তার। একেকটা দিন একেকটা বছরের মতো লম্বা। বিনা কাজে অন্তহীন দীর্ঘ সময় কাটানো কি যে কষ্টকর! সে বি. এস-সি পাশ করেছে দশ বছব আগে। দশ গুন বারো গুন তিরিশ ইত্যাদির গুণফলে যে বিবাট অঙ্ক দাঁড়ায়, ততগুলো দিন, সময়ের সেই বিশাল অংশটা পিঠ বাঁকিয়ে ঘাড় গুঁজে দু-হাতে ঠেলে ঠেলে পার হয়ে এসেছে অমিত। সময় তার ওপর পাষাণভারের মতো চেপে আছে।

বেকার ছোকরারা চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে সাট্টা-টাট্টা খেলে, ফুটবল মাঠে সিনেমা হলে লাইন-টাইন লাগিয়ে, মেয়েদের হিড়িক দিয়ে, সিটি মেরে, বাংলা মাল খেয়ে কিংবা দুর্গা পুজো কার্তিক পুজো আর শিবরাত্রির চাঁদা তুলে ফাইন সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওসব পারে না অমিত, তার নার্ভ খুব দুর্বল।

সময় কাটাবার জন্য রোজই রাস্তায় রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ায় অমিত। আজও ঘুরতে লাগল। এখন বাড়ি গিয়ে কী-ই বা করবে? কোথাও তার কোন কাজ নেই। অবশ্য শ্যামবাজারে মল্লিকসাহেবদের বাড়ি একবার যাওয়া যায়। রুমী এবার হায়ার

সেকেণ্ডারি দেবে, ক'দিন বাদেই টেস্ট। মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল একটু যত্ন করে পড়ালে স্ট্যাণ্ডও করে যেতে পারে। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ল, খানিকক্ষণ আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছে ওদের আর পড়াবে না। মল্লিকসাহেব তার নাকের ডগায় চাকরির টোপ ঝুলিয়ে মাসের পর মাস একসপ্লয়েট করে যাচ্ছে! একটা স্কাউণ্ড্রেল।

মাথার ওপর আকাশটা থম ধরে আছে। অমিত এলোমেলো হাঁটতে লাগল। সার্কুলার রোড থেকে ক্যামাক স্ট্রীট, সেখান থেকে সেকপীয়ার সরণি আর হো-চি-মিন সরণি হয়ে লিটল রাসেল স্ট্রীট পেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

আজকাল পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে বিরাট বিরাট স্কাইস্ক্রেপার উঠছে। বেশির ভাগই ওনারশিপ ফ্ল্যাটের বাড়ি, কিছু কিছু আছে অফিস বিল্ডিং—ব্যাঙ্কের, ইন্সিওরেন্সের কিংবা বেসরকারী কোন কোম্পানির। কলকাতার নতুন স্কাইস্ক্রেপার কমপ্লেক্সটা এদিকেই গড়ে উঠছে।

পার্ক স্ট্রীটের কোণে একটা চব্বিশ তলা বাড়ির বেসমেন্টের কাজ চলছিল। ঝড়াং ঝড়াং করে পাইল ড্রাইভিং চলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তা-ই দেখল অমিত। তারপর অন্যমনস্কর মতো পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে মেট্রোর কাছে চলে এল। এতটা হাঁটার পর এখন তার ক্লান্তি লগেছে, খিদেও পাচ্ছে দারুণ। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দুটো রুটি আর এক কাপ চা খেয়ে এসেছিল। তারপর অবশ্য মল্লিকসাহেব আরেক কাপ চা খাইয়েছেন। পাকস্থলী কখন সেগুলো হজম করে ফেলেছে। অমিতের মনে পড়ে গেল, আসার সময় মা লুকিয়ে তিনটে টাকা দিয়েছিল। যেদিনই সে কলকাতায় আসে মা লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-একটা টাকা দেয়। মা ইজ গ্রেট। মা না থাকলে মরে যেত অমিত।

সেই টাকা তিনটে থেকে ষাট পয়সা খরচ হয়েছে। গাড়ি ভাড়া আরো পঞ্চাশ ষাট পয়সা খরচ হবে। তারপরও প্রায় দু টাকার মতো থেকে যাবে। অমিত সামনের সাউথ ইণ্ডিয়ান

রেস্তোরাঁটায় ঢুকে গেল। দুটো ইডলি, তার সঙ্গে ফাউ চাটনি আর সম্বর—আশী পয়সায় ফাইন একখানা লাঞ্চ হয়ে গেল। কলকাতায় ফ্যানের তলায় টেবল চেয়ারে বসে এর চাইতে সস্তায় আর কিছু খাওয়া যায় না। অবশ্য ফুটপাথে রিক্সা এবং ঠেলাওলাদের সঙ্গে বসে পেতলের থালায় ছোলার ছাতু আর তেঁতুলের আচার দিয়ে আরো 'চীপ' লাঞ্চ সারা যায়। রিক্সাওলাদের সঙ্গে বসে খেতে আপত্তি নেই অমিতের। তাতে তার সম্মানহানি ঘটবে না। তবে ছোলার ছাতুটা সে হজম করতে পারে না। নার্ভের মতো তার পাকস্থলীও কমজোরী।

খাওয়ার পর আরো অনেকক্ষণ এধারে ওধারে ঘুরল অমিত। কার্জন পার্কে ইরাণী বেদেরা হারমোনিয়াম আর ঢোল বাজিয়ে পপুলার হিন্দী ফিল্মের গান গাইছে: তাদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। আরেক ধারে হিন্দুস্থানীদের কুস্তিটুস্তি চলছে; সেখানেও ভিড়। কেউ কেউ এরই মধ্যে 'শিরমালিশওলা'দের দিয়ে মাথা টিপিয়ে নিচ্ছে, কেউ কানের খোল বার করাচ্ছে। একদল বসেছে নানারকম পাখির তেল নিয়ে। বড় বড় ডেকচিতে আলকাতরার মতো কালো তেলের মধ্যে সেদ্ধ-করা পাখিদের ডানা, ঠোঁট, পা ইত্যাদি ভাসছে। এধারে রেডিমেড জামাকাপড়ের স্টল, ওধারে ফলের সারি সারি দোকান, তার উল্টোদিকে বাস টারমিনাসের গায়ে পেচ্ছাপের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এপাশে ওপাশে গারবেজের পাহাড়। তার ওপাশে রাস্তা পেরিয়ে হকারদের বাজার। সেখানে জাপানী ট্রানজিস্টর থেকে আমেরিকান টেপ রেকর্ডার পর্যন্ত যাবতীয় জিনিস মেলে। তার ওপরেই একটা ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কের বিরাট হোর্ডিং —'ক্যালকাটা ইজ আওয়ার সিটি, কীপ ক্যালকাটা ক্লীন।' মনুমেণ্টের তলায় আজ বোধ হয় মীটিং আছে, সেখানে মাইক-টাইক লাগানো হচ্ছে।

সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে আলতোভাবে ভেসে বেড়াল অমিত:

তারপর বাবো নম্বর একটা ট্রামে উঠে শেয়ালদায় এল। ডাউন লোকাল ট্রেন ধরে সে যখন রানীবাজারে ফিরল সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে, মেরুদণ্ডের মতো যে রাস্তাটা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল অমিত।

এ শহরের নিজস্ব একটা নাম থাকলেও রানীবাজার ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টেরই একটা অংশ। কলকাতা তো কখনও থেমে নেই। তার বাড়ন্ত শরীরের মধ্যে চারপাশের অগুনতি শহর আর গ্রামের মতো রানীবাজারও ঢুকে গেছে।

অমিত যে রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছিল তার দু-ধারে বাড়িঘর, পুরনো মন্দির, মাঝে মাঝে খানিকটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ঝোপঝাড়, কচুরিপানায় ভর্তি খাল, রিফিউজি কলোনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এই শীতের সন্ধ্যেয় দু-পাশে রানীবাজার মিউনিসিপ্যালিটির দেখন-হাসি আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। এ আলোতে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। আসলে এটা নিয়মরক্ষা। রাস্তায় রাস্তায় চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব ঝুলিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির লাইট ট্যাক্সটি ঠিক আদায় করে নিচ্ছে।

মিনিট কুড়ি হাঁটার পর বাজারের মতো একটা জায়গায় এসে পড়ল অমিত। এ জায়গাটা বেশ জমজমাট। এখানে জামা কাপড়, রেডিমেড গারমেণ্টস, রেডিও, সেলাইকল, জুতো ইত্যাদির অনেকগুলো দোকান। এ ছাড়া আছে মোটর গ্যারেজ, সাইকেল মেরামতের কারখানা, লণ্ড্রী, হরেকরকম জিনিসের গোটাকয়েক স্টোর, ডেকবেটরের দোকান। আর আছে একটা সিনেমা হল যার নাম 'অলঙ্কার'; হিন্দী ছবি ছাড়া এখানে আর কিছুই দেখানো হয় না।

এই সন্ধ্যেবেলায় এ জায়গায় বেশ ভিড়। দোকানপাট সবই খোলা রয়েছে। সিনেমা হলে ইভনিং শো বসবে; তার আগে সমারোহ করে মাইকে হিন্দী ফিল্মের গান বাজানো হচ্ছে।

অমিত বিশেষভাবে কোন কিছু দেখছিল না ; অন্যমস্কর মতো মানুষজন দোকানপাটের দিকে তাকাতে তাকাতে হেঁটে যাচ্ছিল। সে যখন বাজারের মাঝামাঝি চলে এসেছে সেই সময় কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, ''অমিত—অমিত—'

অমিত দাঁড়িয়ে গেল। এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে তার চোখে পড়ল, গিরিধারী ট্রেডার্স থেকে সুরেশ্বর পালিত তাকে ডাকছে। এই লোকটা কখনও তাকে ডাকে-টাকে না, ক্বচিৎ কখনো রাস্তায় দেখা-টেখা হলে 'কেমন আছ', 'কী করছ' জাতীয় দু-একটা অতি সাধারণ মামুলি কথাবার্তা হয়। একটু অবাকই হল অমিত, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

'গিরিধারী ট্রেডার্স' বাজারের সব চাইতে বড় দোকান . একরকম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরই বলা যায়। এর এক অংশে মুদিখানা, এক অংশে রেডিমেড পোশাকের কাউন্টার, বাকিটা জুড়ে পাউডার-ক্রিম-শ্যাম্পু ইত্যাদি থেকে যাবতীয় মনোহারি জিনিসের দোকান। সুরেশ্বর পালিত গিরিধারী ট্রেডার্সের সোল প্রোপ্রাইটর : প্রকাণ্ড টিনের সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে সেই কথাই লেখা আছে।

সুরেশ্বর পয়সাওলা লোক ; দেখেই সেটা টের পাওয়া যায়। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, সারা গায়ে তার প্রচুর মাংস। গোলমতো মুখ গলা নেই বললেই হয়, গোল চোখ, পাঁচ নম্বর কড়াইর মতো পেট—লোকটার সবই গোলাকার। দেখতে দেখতে স্কুলের গ্লোবের কথা মনে পড়ে।

সুরেশ্বর তার দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে বসে ছিল। জায়গাটা মেঝে থেকে তিন চার ফুট উঁচু এবং পেতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখান থেকে মুদি, মনোহারি এবং রেডিমেড পোশাক—তিন দিকেই লক্ষ্য রাখা যায়। তিন দিক থেকে দোকানের কর্মচারীরা টাকা এবং বিল পাঠিয়ে দিচ্ছে, হিসেব মিলিয়ে দাম নিচ্ছে সুরেশ্বর।

অমিত কাছে এসে বলল, 'কিছু দরকার আছে সুরেশ্বরকাকা ?'

ছেলেবেলা থেকেই স্থরেশ্বরকে দেখছে সে ; এই রানীবাজারের আদি বাসিন্দা ওরা। এক সময় তাদের বাড়ি স্থরেশ্বরের যাতায়াত ছিল। তখন অবশ্য তার ব্যবসা এত ফুলেফেঁপে ওঠে নি। একই জায়গার মানুষ, তা ছাড়া অমিতের বাবাকে সে 'দাদা' বলে, এই স্থবাদে অমিতরা তাকে বলে স্থরেশ্বরকাকা।

দোকানে বেশ ভিড় ছিল। ক্যাশকাউণ্টারের রেলিং-এর বাইবে একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে স্থবেশ্বব বলল, 'কথা আছে। একটু বোসো—ভিড়টা কমুক।'

অমিত বসে থাকল। মিনিট দশকেব মধ্যে ভিড় পাতলা হয়ে এলে স্থরেশ্বর বলল, 'সান্নু খুব ঝামেলা করছে--'

অমিত চমকে উঠল। সান্নু তার ছোট ভাই। বলল, 'কী হয়েছে?'

'এই যে—' খচমচ কবে কতকগুলো কাগজ হাঁটকে একটা বিল বার করল স্থরেশ্বর। সেটা অমিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'টাকার ফিগারটা দেখ—'

অমিত দেখল, এটা সরস্বতী পুজোর চাঁদার বিল। পুজোটা করছে সান্নুদের ক্লাব 'থার্টি বুলেটস'। তলায় চাঁদার যে অঙ্কটা লেখা আছে তাতে রক্তচাপ বেড়ে যাবার কথা। অঙ্কটা হল দুশো টাকা। বিল থেকে চোখ তুলে স্থরেশ্বরের দিকে তাকাল অমিত।

স্থবেশ্বর বলল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

অমিত ঘাড় কাত করল ; পারে নি।

স্থরেশ্বর আবার বলল, 'পরশু সান্নু তার গ্যাং নিয়ে এসেছিল ; এই বিলটা ধরিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছে দু-একদিনের ভেতর টাকাটা নিতে আসবে। সরস্বতী পুজোয় দুশো টাকা চাঁদা, তুমি ভাবতে পারো?' বলতে বলতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল স্থরেশ্বর।

অমিত কি বলবে, ভেবে পেল না।

স্থরেশ্বর থামেনি, 'সান্নু বলে গেছে, ওই ফিগার থেকে এক নয়া

পয়সা কম নেবে না। তুমিই বল অমিত, সরস্বতী পুজোয় দুশো টাকা চাঁদার কথা কখনও শুনেছ? এটা কি যুক্তিযুক্ত? শেষ শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিল সুরেশ্বর।

'না, মানে—'

'তোমার বাবা একজন রেসপেক্টবল ম্যান: আমি তাঁকে দাদা বলি, শ্রদ্ধা করি। তুমি এত ভদ্র ভালো ছেলে। সান্নু কি করে তোমাদের ফ্যামিলিতে জন্মাল, ভাবতেই পারি না। দিনরাত থার্ড-ক্লাস বখা ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে, লঘুগুরু জ্ঞান নেই, সবার নাকের ওপর সিগারেট খাচ্ছে। এখন চাঁদা চাঁদা করে জুলুমবাজি চালাচ্ছে।'

অমিত জানে সান্নু উদ্ধত, বেপরোয়া: কথায় কথায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দু-তিন বছর আগেও সান্নু এরকম ছিল না। খুব শান্ত, নম্র আর লাজুক ধরনের ছেলে ছিল সে। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না।

লেখাপড়ায় খুব একটা ভালো না সান্নু। থার্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ও আর কলেজে ভর্তি হয় নি: আই-টি-আই থেকে ইলেকট্রিকের ব্যাপারে কী একটা সার্টিফিকেট নিয়েছিল। হাতের কাজ জানা থাকলে চাকরি-টাকরি পেতে সুবিধা। কিন্তু তিন চার বছর এখানে ওখানে ছোটাছুটি করেও দেড় শো দুশো টাকা মাইনের সামান্য একটা কাজও জোটাতে পারে নি সান্নু। তারপর থেকেই ছেলেটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল। ক্রমশ তাকে দেখা গেল, 'অলঙ্কার' সিনেমার সামনে বসে রানীবাজারের রকবাজ বাজে ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে: সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করছে। মারামারির জন্য তিন চারবার তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

অমিত সুরেশ্বরকে কি বলতে যাচ্ছিল, একদল ছোকরা নিয়ে সান্নু হুড়মুড় করে গিরিধারী ট্রেডার্সে ঢুকে পড়ল।

সান্নুর বয়স তেইশ চব্বিশ। চ্যাটালো বুক, চওড়া কাঁধ, কপালের ওপর থেকে বড় বড় লালচে চুল অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত ওর, শক্ত মজবুত স্বাস্থ্য। পরনে মার্কিনী প্যান্ট, সব মিলিয়ে প্যান্টটার ছ'টা পকেট—দুটো সাইড পকেট, দুটো হিপ পকেট, দুটো পকেট হাঁটুর কাছেও। এ ছাড়া শার্ক স্কিনের বুশ সার্ট, তাব ওপব চামড়ার জ্যাকেট। বাঁ-হাতে ঢলঢলে ব্যাণ্ডে অটোমেটিক ঘড়ি, ডান হাতে স্টীলের বালা। জ্যাকেটের কলার বেপবোয়া ভঙ্গিতে তুলে দেওয়া।

ক'বছব আগে মুখখানা ভাবি স্নিগ্ধ আব সুন্দব ছিল সান্নুব; মনে হতো কিশোবেব মুখ। সেই সুকুমাব কোমল মুখশ্রী আর নেই। এখন সান্নুর তাকানোব ভঙ্গিটা রুক্ষ, চোয়াল এবং থুতনির হাড অত্যন্ত উদ্ধত। তাব সমস্ত চেহারাটাব মধ্যেই যুদ্ধেব ঘোড়াব মতো এক ধবনেব উগ্রতা।

সান্নু বাঁ হাতটা তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সুরেশ্বরকাকা চাঁদাটা দিয়ে দিন।'

সুবেশ্বব কিছু বলল না, দাঁতে দাঁত চেপে স্থিব চোখে তাকিয়ে থাকল।

সান্নু আবাব বলল, 'তাড়াতাড়ি ছাড়ুন; আমাদের আবার অন্য জায়গায় কালেকসানে যেতে হবে।'

'দু শো টাকা সরস্বতী পুজোর চাঁদা! তোমরা ভেবেছ কী, অ্যাঁ?' সুরেশ্বর অবরুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'দেখছেন না, দেশে লেখাপড়ার বারোটা বেজে যাচ্ছে। মা সরস্বতী বিদ্যাব দেবী তো; ভাবছি তাঁর পুজোটা এবার লার্জ স্কেলেই করব। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। দিন, টাকাটা দিন—'

'কী ব্যাপার?'

'জানেনই তো আমবা বেকার যুবক—আন-এমপ্লয়েড ইঁওথ।

চাকরি নেই বাকরি নেই, আমাদের চলে কি করে? ফ্র্যাংকলি বলছি, চাঁদা তুলে তার থেকে আমরা খানিকটা করে শেয়ার নেব।'

'চাকরি নেই তার জন্যে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে? তার জন্যে আমি দায়ী?'

সহানুভূতির গলায় সানু বলল, 'আপনি একা দেবেন কেন, রানী-বাজারের সবাই দিচ্ছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'সরস্বতী পুজোর পর বাসন্তী পুজো, দোল, নববর্ষ উৎসব, গণেশ পুজো, মনসা পুজো, দুর্গাপুজো, শিবরাত্রি—শালা যত পুজো আর উৎসব আছে, আমাদের ক্লাব 'থার্টি বুলেটস' ঠিক করেছে, যদ্দিন না আমাদের চাকরি-টাকরি হচ্ছে সব পালন করবে। আর পুজোটুজোর আগে আপনাদের কাছে ডোনেসনের জন্যে আসতে হবে। বেকার যুবক কিনা। নিন তাড়াতাড়ি টাকটা ছাড়ুন—'

অমিত একটা কথাও বলছে না। ক্যাশ-কাউন্টারের ওপাশে বসে লক্ষ্য করছে, সুরেশ্বরের চোখের সাদা জায়গাটা লাল হয়ে যাচ্ছে। গলার কাছের একটা শির দড়ির মতো পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। মুখ প্রচণ্ড রক্তচাপে ফেটে যাবে, মনে হচ্ছে।

সুরেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'দু শো! ইয়ার্কি পেয়েছ! দেব না, এক পয়সাও দেব না।'

চোয়াল শক্ত হল সানুর, কপালের রগদুটো দ্রুত লাফিয়ে যাচ্ছে। তবু শান্ত গলায় সে বলল, 'দিয়ে দিন—'

'না, দেব না। গেট আউট—গেট আউট।'

'এতদিন কাকা বলেছি; এবার তা হলে শালাই বলি। বার কর শালা, এক্ষুনি বার কর—'

হঠাৎ যেন অমিতের কথাটা মনে পড়ে গেল সুরেশ্বরের। অপমানে রাগে উত্তেজনায় তার মুখ ঝলসে যাচ্ছিল। অমিতের দিকে ফিরে সে বলল, 'দেখ অমিত, দেখ—এই তোমার ভা-আ-আ-ই—' শেষ দিকটা সে যেন তোতলা হয়ে গেল।

সান্নু কাউন্টারের ধারে তার দলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অমিতকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এ কি দাদা, তুমি এখানে কী করছ ?'

অমিতের খুব খারাপ লাগছিল। তার দুর্বল নার্ভগুলো সমানে লাফাচ্ছে। সেরিব্রাল পয়েন্ট থেকে গোটা পিঠটায় যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। কোনরকম উত্তেজনা সে সহ্য করতে পারে না। সান্নু আর সুরেশ্বরের চিৎকার, তর্কাতর্কি, তাদের মধ্যে যুদ্ধের মতো আবহাওয়া অমিতকে অসুস্থ করে তুলেছিল। শিথিল গলায় সে বলল, 'সুরেশ্বর-কাকা ডেকেছিল, তাই—'

'তুমি এখানে থেকো না দাদা, এসব ঝামেলার মধ্যে থাকার দরকার নেই। তোমার তো আবার একটুতেই ঘাড়েপিঠে ব্যথা হয়।'

অমিত উঠে দাঁড়াল। সুরেশ্বর, তার গিরিধারী ট্রেডার্স, চার-পাশের লোকজন, দোকানের উজ্জ্বল টিউব আলো, সান্নু এবং তার সঙ্গের ছোকরারা—কিছুই এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না সে। তার চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বহুদিনের জ্বরে-ভোগা মানুষের মতো দুর্বল নড়বড়ে পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল অমিত। বাড়ির দিকে যেতে যেতে সে শুনতে পেল সুরেশ্বর চিৎকার করছে, 'তুই কতবড় হারামী হয়েছিস একবার দেখব। আমি আজই থানায় ও-সির কাছে ডাইরি করব।'

সান্নুর গলাও শুনতে পাওয়া গেল, 'অনেক শালাই আমার নামে ডাইরি করেছে। ঠিক আছে, তাই কোরো। তোমার কোন ফাদার আমার কিছু করতে পারবে না। ঝামেলা না করে টাকাটা বার করো—কুইক।'

অমিত অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, আর কোন কথা সে শুনতে পেল না। রানীবাজারের আর সবার মতো সে-ও জানে সুরেশ্বর পালিতের প্রচুর পয়সা। শুনেছে সুরেশ্বর লোক ভাল নয়।

তার ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম। এই গিরিধারী ট্রেডাসটা বাইরের দিকের ঠাট ; ভেতরে ভেতরে সে নাকি স্মাগলারদের চাঁই। নানারকম দরকারী জিনিস, যেগুলো না হলে দিন চলে না বাজার থেকে সরিয়ে ব্ল্যাক করে। গুণ্ডা-স্মাগলার-ওয়াগনব্রেকার—এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ। সুরেশ্বরের সঙ্গে কেন যে ঝগড়া করতে গেল সান্টুটা !

কিছুক্ষণের মধ্যে রানীবাজারের পশ্চিম দিকে ঢালীপাড়ায় তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল অমিত।

।। পাঁচ ।।

অমিতদের বাড়িটা পুরানো আমলের একতলা। দেওয়ালগুলোর গায়ে প্ল্যাস্টার নেই ; ইট বেরিয়ে পড়েছে। নোনা হাওয়া আর বৃষ্টিতে ইটগুলো অনেকটা করে ক্ষয়ে গেছে। হাত দিলে পাউডারের মতো মিহি গুঁড়ো লেগে যায়। কার্ণিসগুলো ভাঙাচোরা, রেন-পাইপগুলো জং ধরে ফুটো হয়ে গেছে, সেগুলোর সারা গায়ে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টি পড়লে ফোয়ারার মতো ঝরঝর করে চারদিকে জল ছিটকোতে থাকে ! ঘুলঘুলির ভেতর বংশানুক্রমে পায়রারা বাসা বেঁধে আছে। দেওয়ালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড় অশ্বত্থের চারা শেকড় চালিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। ঘরের মেঝেগুলো ফাটা, বহু জায়গায় চাকলা চাকলা সিমেন্ট উঠে গেছে। একসময় খড়খড়ি-দেওয়া জানালা ছিল, একটাও আর আস্তা নেই, কবেই ভেঙেচুরে গেছে। ভাঙা জায়গাগুলোতে টিন আর প্লাইউডের টুকরো পেরেক দিয়ে সেঁটে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

বাড়ির সামনের দিকে এক কালে সুন্দর একখানা বাগান ছিল। বেল, গন্ধরাজ, সন্ধ্যামালতী, কাঁঠালীচাঁপা—সারা বছর ধরে কত রকমের ফুল ফুটত ! অযত্নে আর অবহেলায় বাগানটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওটা আগাছার জঙ্গল। এখানে-ওখানে ভাঙা ইঁট, বালি, ঘুণে-ধরা বাঁশ, খোয়া ইত্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির পেছন দিকটাও ঝোপঝাড় এবং অজস্র বুনো লতায় ঝুপসি হয়ে আছে।

গোটা বাড়িটা জঙ্গল-টঙ্গল সুদ্ধু ধসে-পড়া একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

সদর দরজাটা হাট করে খোলাই ছিল। অমিত ভেতবে ঢুকে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বারান্দায় এসে উঠল।

এ বাড়িতে মোট চারখানা ঘব। ঘরগুলো পর পর সাজানো। সামনের দিকে লম্বা টানা বারান্দা। অবশ্য ছাদেও একটা ছোট ঘর আছে; সেটার দেয়াল ইঁটের কিন্তু মাথায় টালির চাল।

একতলার এই চারখানা ঘরের একটায় থাকে বাবা, একটায় মা আর মিতু (মিতু অমিতের ছোট বোন), একটা ঘর সান্নুর, বাকিটা বাসুর। আর ছাদের ঘরটায় অমিত থাকে। চাবটে ঘবের মাঝখানে ছাদে যাবার সিঁড়ি।

এই মুহূর্তে বারান্দায় টিমটিম কবে ষাট পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছিল। অমিত দেখল, বাবান্দার শেষ মাথায় একটা হাতল-ভাঙা চেয়াবে বাবা বসে আছে। এ ছাড়া আব কাউকে দেখা গেল না।

অমিত চুপচাপ সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, বাবা হঠাৎ ডাকল, 'অমু নাকি রে?'

বাবা তার সঙ্গে বিশেষ কথাটথা বলে না। আজ কেন ডাকল, কে জানে। অমিতের অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু পায়ে পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আধবোজা গলায় বলল, 'কি বলছ?'

আলোটা বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় জ্বলছে, তাই এতটা দূর থেকে বাবাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আলোআঁধারির ঝাপসা চাদর যেন তার সারা গায়ে জড়ানো।

বাবার বয়েস তেষট্টি চৌষট্টি। শরীরে মাংস কম, হাড়ই বেশি। একসময় দারুণ সুপুরুষ ছিল বাবা। এ্যালবামে তার কম বয়সের, বিয়ের সময়ের এবং তার পরের অনেক ছবি রয়েছে। সেগুলোর সঙ্গে তেষট্টি চৌষট্টি বছরের এই যোগেশ গাঙ্গুলীর কোন মিল নেই। আজকের এই যোগেশ গাঙ্গুলী সেদিনের ধ্বংসাবশেষ। গাল ভেঙে থুতনি এবং চোয়ালের হাড় জাঁতির মতো বেরিয়ে এসেছে, চোখ

এক ইঞ্চি ভেতরে ঢোকানো। হাতে এবং গলার কাছে জটপাকানো শিরগুলো পাতলা চামড়ার তলা থেকে সরুমোটা তারের মতো ফুটে বেরিয়েছে। ওগুলোর মধ্যে রক্ত চলাচল যেন দেখা যায়। মুখে খাপচা খাপচা কাঁচাপাকা দাড়ি।

বাবার পরনে আধময়লা ধুতি আর মোটা লংক্লথের ফুলশার্ট। তার ওপর তুষের আলোয়ান। পনের ষোল বছর ধরে বাবাকে শীতে এই আলোয়ানটা গায়ে দিতে দেখছে অমিত। ওটার আর কিছু নেই। আরশোলায় কেটে অনেক জায়গায় বড় বড় ফুটো করে ফেলেছে। হুড় হুড় করে তার ভেতর দিয়ে শীতের বাতাস ঢুকে যায়। আলোয়ানটা গায়ে দেওয়া না-দেওয়া সমান।

বাবা আবার বলল, 'কলকাতায় গিয়েছিলি ?'

অমিত আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোর মা বলছিল কি একটা চাকবির ব্যাপারে—' এই পর্যন্ত বলে বাবা হঠাৎ চুপ করল।

অমিত বলল, 'হ্যাঁ—'

সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে অনন্ত আগ্রহ নিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করল, 'হল কিছু ?'

শ্বাসরুদ্ধের মতো অমিত বলল, 'না।'

অসীম নৈরাশ্যে পিঠটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিল বাবা। বলল, 'ন'বছর আগে বি. এস-সি পাশ করেছিস। এতদিনে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলি না! তোর আর কিছু হবে না।'

বাবা আগে কখনও এই সুরে কথা বলত না। চিরকালের আশাবাদী এই মানুষটা ক'বছর আগেও 'অমিতকে দারুণ উৎসাহ দিত ; পিঠে একখানা হাত রেখে বলত, 'সিরিয়াসলি চেষ্টা করছিস, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়ে যাবে। ভাবিস না।' বাবার এই কথা-গুলো তার শরীরে সতেজ টনিকের কাজ করত ; রক্তপ্রবাহে দুর্দান্ত এনার্জির ছোটাছুটি অনুভব করত অমিত। কিন্তু তিন চার বছর

ধরে বাবা কেমন হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। উজ্জ্বল সজীব আশাবাদ থেকে ক্রমশ নৈরাশ্যের ভেতর ডুবে যাচ্ছে সে।

বাবার দিকে তাকাতে পারছিল না অমিত। ঘাড়টা ভেঙে ঝুলে পড়ল যেন।

বাবা আবার বলল, 'সান্নু আব বাসু কিছু আনছে বলে তবু সংসারটা চলছে। নইলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়ে যেত।'

এই কথাগুলো একেবারে নতুন; অমিত চমকে উঠল। সান্নু সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে জোরজবরদস্তি চাঁদা তুলে যা পায়, তার থেকে খানিকটা বাবার হাতে তুলে দেয়। বাসুর রোজগারের পথটা আরো খারাপ, আরো সাঙ্ঘাতিক। সে-ও বাবাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে থাকে। সান্নু আর বাসুর টাকায় এখন সংসার চলছে। অথচ বাবা দু-তিন বছর আগেও ওদের নাম শুনলে ক্ষেপে উঠত। ওদের টাকাব কথা ভাবলে ঘেন্নায় শবীর কুঁকড়ে যেত তার। আশ্চর্য, হাত পেতে আজ ওদেবই টাকা নিচ্ছে।

একসময় বাবা ছিল দুর্দান্ত আদর্শবাদী। পায়ের তলা থেকে মাথাব চুল পর্যন্ত সৎ, সতেজ, সমুন্নত একটি মানুষ। বি-এ পাশ করার পরই গভর্ণমেণ্টের একাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে আপার ডিভিসন ক্লার্কে-র চাকরি পেয়েছিল বাবা, ডিপার্টমেণ্টের যে সেকসনে তার কাজ সেটা বিল সেকসন। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার চেক পেমেণ্টের ব্যাপার ছিল। বিল তাড়াতাড়ি পাস করিয়ে দিলে ক্লায়েণ্টের কাছ থেকে মোটা ঘুষ পাওয়া যেত। বাবা লক্ষ্য করছিল, সেকসনের সবাই ঘুষের টাকা ভাগাভাগি করে নিত। সে যাবার পর তার ভাগেও কিছু আসার কথা। কিন্তু বাবা যেদিন চাকরিতে জয়েন করেছিল, সব দেখেশুনে তার পরের দিনই রেজিগনেসন দিয়েছে। সহকর্মীরা অবাক, এমন একটা লোভনীয় চাকরি কেউ ছাড়তে পারে, সেটা তাদের পক্ষে অভাবনীয়। অনেক বুঝিয়েছে তারা কিন্তু বাবা অবিচলিত, এমন চাকরি সে করবে না।

বাবাকে মুখের ওপর অনেকে বলেছে আহাম্মক, কেউ কেউ তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। চাকরি ছাড়ার পর কত রকমের কাজ করেছে বাবা তাব কোন হিসেব নেই। কলকাতা থেকে দার্জিলিং আর আসামের চা কিনে এনে রানীবাজার এবং আশপাশের শহরগুলোর দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিয়েছে। ছোট ছোট কোম্পানি—যারা স্নো, পাউডার, আলতা ইত্যাদি তৈবি করে, তাদের এজেন্সি নিয়েছে, কিছুদিন টিউসানি করেছে। একবার স্কুলমাস্টারিও নিয়েছিল। দু-আড়াই বছর একটা মাঝারি ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজও কবেছে। বাবার চরিত্রে দৃঢ়তা সততা যতই থাক সাংসারিক জীবনে সে টোটাল ফেলিউর—সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তবু অমিতের একটা গর্ব ছিল—চাবদিকেব নোংরামি, দীনতা এবং কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে বাবা তলিয়ে যায়নি। অন্ধকারে উজ্জ্বল বাতিঘরের মতো মনে হতো বাবাকে। সেই মানুষ এখন সান্থু বাসুর টাকা নিচ্ছে। শুধু তাই না, বাবাব আজকের কথাগুলোতে তাদের সম্বন্ধে একটু মমতাও যেন মেশানো। বাবা কি ওইভাবে টাকা আনবার ইঙ্গিত দিল? আবার কি বলতে যাচ্ছিল বাবা, রান্নাঘরের দিক থেকে মা এল। রান্নাঘরটা বারান্দাব ওই প্রান্তে। টিন দিয়ে ঘিরে ওটা করে নেওয়া হয়েছে। মা বলল, 'কখন এলি অমু?'

অমিত ঘাড় তুলে তাকাল। মায়ের রঙ শ্যামলা, পানপাতার মত মুখ, সরু চিবুক, বড় বড় চোখ। ছোটখাটো চেহারার মাকে ঘিরে একসময় স্নিগ্ধ আভার মতো লাবণ্য যেন মাখানো থাকত। চেহারা এখন অনেক ভেঙে গেছে। চুল উঠে কপালটা বেশ বড় দেখায়, মাঠের মাঝখানে সূর্যোদয়ের মতো সেই কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। তবু সেদিনের সেই লাবণ্যের সবটুকুই এখনও খোয়া যায় নি।

মায়ের পরনে লাল পাড় মিলের শাড়ি আর হ্যাণ্ডলুমের সবুজ

ব্লাউজ, তার ওপর মোটা খদ্দরের চাদর। পায়ে রবার সোলের সস্তা চটি।

মা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতা থেকে কখন এলি অমু?'

অমিত বলল, 'খানিকক্ষণ আগে।'

'মল্লিকসাহেব কী বললে?'

অমিত কিছু বলবার আগেই বাবা মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। দু হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কি আর বলবে! সেই পুরনো রেকর্ড নাকি আরেক বার বাজিয়ে দিয়েছে—এখন চাকরি হবে না। সব ব্লাফ—ভাঁওতা। মল্লিকসাহেব নামে কেউ আছে বলেই আমার মনে হয় না।'

অমিতের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। ঘাড়ের কাছে আবার সেই ব্যথাটা অনবরত ছুঁচ ফোটাতে শুরু করেছে। কি বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না। গলার ভেতর শক্ত ডেলার মতো কিছু একটা আটকে গেছে।

মা বাবাকে বলল, 'শুধু শুধু ছেলেটাকে বকছ কেন? ও কি চাকরির চেষ্টা করছে না?' অমিতকে বলল, 'যা অমু, তোর ঘরে যা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

ছেলেবেলা থেকেই সে দুর্বল, তার নার্ভ অসুস্থ। রোগাভোগা ছেলে, মা তাই দুই ডানা মেলে চিরকাল তাকে আগলে আগলে রেখেছে। একপলক মাকে দেখল অমিত। তারপর মাথা নিচু করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে শুনল বাবা গজগজ করছে, ''ছোট ভাইরা সংসার চালাবে, আর উনি খালি ব্লাফ দিয়ে যাবেন—'

একটু পর ছাদে তার নিজের ঘরে চলে এল অমিত। বোতাম টিপে আলো জ্বালল।

ঘরটা বেশ নিরিবিলি, এ-বাড়িতে থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন, অনেকটা অমিতেরই মতো।

একধারে ছোট তক্তাপোষে এলোমেলো অগোছালো বিছানা। সকালে ঘুম থেকে উঠে কলকাতায় যাবার সময় অমিত যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে ; মা কিংবা মিতু বিছানাটা গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়ে যায় নি। হয়তো ভুলে গেছে। আরেক ধারে মাঝারি একটা টেবলের ওপর রাজ্যের জিনিস—শেভিং বক্স, আয়না, চার পাঁচটা পুরনো ব্লেড, দু-একটা কবিতার বই, কিছু লিটল ম্যাগাজিন, সস্তা দামের প্লাস্টিকের চিরুনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের এক খানা ছবি, তার উল্টোদিকের দেয়ালটায় একটা আধভাঙা ব্র্যাকেটে ক'টা ময়লা জামা টামা ঝুলছে।

ব্র্যাকেট থেকে একটা পাজামা আর বুশ শার্ট নামিয়ে পরনের বেলবটস টটসগুলো বদলে নিল অমিত। বাইরে একটা টিনের ড্রামে জল থাকে। সেখান থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে আলো নিভিয়ে কালকের চটকানো বাসি বিছানায় সোজা শুয়ে পড়ল। এখন কিছুই তার ভাল লাগছিল না।

কতক্ষণ পর কে জানে, নিচ থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, 'অমু —অমু—'

অমিত উঠে পড়ল। ঘরের দরজার কাছে এসে বলল, 'কী বলছ ?'

'খাবি আয়।'

সেই কখন সাউথ ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় ইডলি মিডলি কি একটু খেয়েছিল। এখন দারুণ খিদে পেয়ে যাবার কথা, পেয়েছেও। কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছা করছিল না অমিতের। সে বলল, 'আমি খাব না—'

মা বলল, 'খাবি না কেন ?'

'এমনি—'

'আয় বলছি। এত বড় রাত, না খেলে শরীর খারাপ হবে।'

'না।' অমিত আবার তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে মা চুপ করে গেল।

মিনিট সাত আট পর খুট করে সুইচ টেপার শব্দ হল, তারপরেই ঘর আলোয় ভরে গেল। চোখ মেলে অমিত দেখল মিতু এসেছে। তার এক হাতে কলাই-করা থালায় খানকয়েক রুটি, পাশে দুটো ছোট বাটিতে ডাল-তরকারি কিছু হবে, অন্য হাতে জলের গেলাস।

মিতুর বয়স বাইশ তেইশ। রোগা ফ্যাকাসে চেহারা। লম্বাটে মুখ, পাতলা নাক, বিষণ্ণ চোখ, ছিপছপে হাল্কা শরীর, এ সবের মধ্যেও ইস্পাতের ফলার মতো কিছু একটা আছে—অনমনীয় এবং কঠিন।

বছর তিনেক আগে ওর বিয়ে হয়েছে। বাবা প্রচুর টাকা ধার টার করে, এই বাড়িটা বাঁধা রেখে মিতুর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা সুখের হয় নি, এক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মিতুর স্বামী সুবিমলের অভিযোগ, মিতুর চরিত্র ভাল না। আসলে সুবিমল ওর অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে দারুণ জড়িয়ে পড়েছে। মিতুকে ডাইভোর্স করে সেই মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চায়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা মেনে নেবার জন্য বলেছিল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কমপেনসসন দেবে, তা ছাড়া বিয়ের সময় তারা যা যৌতুক-পণ-গয়না-টয়না দিয়েছিল, সব ফেরৎ দেবে। কিন্তু মিতু তাতে রাজী হয়নি। পরে ঝগড়াঝাটি মারধোর করে মিতুকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। শাসিয়েছে তার কথায় রাজী না হলে কোর্টে যাবে, সে যে খারাপ মেয়ে, নানা লোকের সঙ্গে যে তার যৌন সম্পর্ক আছে সেটা প্রমাণ করে দেবে। বাবা-মা সব শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, মিতুকে বুঝিয়েছিল কোর্টে গেলে এই যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন আর মুখ দেখানো যাবে না। সুবিমল যা নোংরা ধরনের লোক, তার সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। তার চাইতে মিউচুয়াল সেপারেশনে রাজী হওয়া মন্দের

ভাল। মিতু বলছে, 'যা হবার হবে, ওর দৌড় কতদূর আমি দেখতে চাই। কোর্টে উঠে আমাকে খারাপ প্রমাণ করবে তো ; করুক—' একটু থেমে আবার বলেছে, 'আমার জীবন নষ্ট করে দিয়ে ও আরেক জনকে নিয়ে মজা করবে, সেটা আমি হতে দেব না, কিছুতেই না।' সুবিমল এখনও কোর্টে যায় নি ; যাবে বলে প্রায়ই খবর পাঠাচ্ছে। মিতুর স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করা আর কি। মিতু কিন্তু অনমনীয়। কোর্টে কেস উঠলে সে পিছু হটবে না। সুবিমল আর মিতুর মধ্যে আপাতত একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

অমিত বলল, 'এগুলো আবার আনলি কেন ? বললাম তো খাব না।'

মিতু বলল, 'মা পাঠিয়ে দিল—'

একটু চুপ করে থেকে অমিত বলল, 'আচ্ছা, ওই টেবিলে রাখ—'

রুটির থালা আর জলের গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে মিতু চলে যাচ্ছিল, অমিত ডাকল, 'শোন—'

মিতু দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছ ?'

ক'দিন সুবিমলের খবর নেওয়া হয়নি। অমিত জিজ্ঞেস করল, স্কাউণ্ড্রেলটা এখন কী বলছে ?'

মিতু চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। আস্তে করে বলল, 'নতুন কিছু না।'

বিয়ের আগে কি দারুণ হাসিখুশিই না ছিল মেয়েটা। কথায় কথায় হেসে উঠত। লাফাতে লাফাতে এই ছাদে উঠে আসছে, আবার তক্ষুনি নেমে যাচ্ছে। হৈ-হৈ করে সবসময় বাড়িটা মাথায় করে রাখত সে। অবুঝ বালিকার মতো তার ছিল সর্বক্ষণ বায়না—এটা চাই, সেটা চাই। না পেলে নাকে কাঁদত। সেই তাজা টাটকা প্রাণবন্ত মেয়েটা ক' মাসে শুকিয়ে কি হয়ে গেছে! ওকে ঘিরে এক ধরনের গাঢ় বিষাদ যেন সব সময় মাখানো থাকে।

মিতু যে বাড়িতে আছে আজকাল টেরই পাওয়া যায় না—সর্বক্ষণ সে চুপচাপ, মলিন আর ক্লান্ত।

অমিত কয়েক মুহূর্ত মিতুর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপব বলল, 'আচ্ছা তুই যা—'

বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে মিতু চলে গেল। তারপরও কিছুক্ষণ ওর কথা ভাবল অমিত। একসময় বড় করে শ্বাস ফেলে টেবলেব কাছে চলে এল।

খাওয়া-দাওয়াব পব আলো নিভিয়ে আবাব পুরনো লেপে মাথা পর্যন্ত ঢেকে অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকল অমিত। কিন্তু ঘুম আসছে না। বিছানায় এধার-ওধার করে হঠাৎ উঠে পড়ল সে। আবার আলোটা জ্বালল। টেবল থেকে একটা লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, ভাল লাগল না। ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে টেবলের দিকে ছুঁড়ে দিল সে; তারপর মাথার দিকের ছোট জানলাটা খুলে দিল। ওটা উত্তর দিক; হুড় হুড় করে কয়েক ঝলক শীতের বাতাস ঘরের ভেতর চাবুকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাওয়াটা যেন হিমালয়ের হাওয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। মুখটা ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছে তবু জানালাটা বন্ধ করল না অমিত। বাইরে তাকিয়ে রইল।

এখন ক'টা আর বাজে; সাড়ে ন'টা কি দশটা। কিন্তু এরই মধ্যে গোটা রানীবাজার লেপের তলায় ঢুকে গেছে। হিমে চারদিক আড়ষ্ট। কয়েক হাজার স্তর কুয়াশার ওপাশে তারা কিংবা চাঁদ অথবা আকাশ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোণাকুণি ওধারে সরু রাস্তায় একতলা বাড়িটার দিকে চোখ গেল অমিতের। ওটা নীলাদের বাড়ি। নিজস্ব নয়, ওরা ভাড়ায় থাকে, সাত আট বছরের মতো আছে।

নীলাদের গোটা বাড়িটা ঘুমে অসাড় কিন্তু ডানধারের শেষ ঘরটায় আলো জ্বলছে। অমিত জানে ওটা নীলার ঘর। নীলা কি আজ রাত্রে কলকাতায় যায় নি?

হঠাৎ অমিতের মনে পড়ে গেল, অনেক অনেকদিন বাদে আজ স্টেশনে নীলা তার সঙ্গে কথা বলেছে। তক্ষুনি আবো মনে পড়ল, সতীর সঙ্গেও আজ দেখা হয়েছে। অমিত পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

সকালে বাসুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল অমিতের। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল বেশ বেলা হয়ে গেছে। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা, সেখানে বাসু দাঁড়িয়ে আছে, তার চারপাশ দিয়ে শীতের নিরুত্তেজ সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

বাসু বলল, কখন থেকে ডাকছি। কি টেবিফিক ঘুম তোমার দাদা! কার ফাদারের সাধ্যি জাগায়।' বলতে বলতে ঘরের ভেতর এসে ঢুকল। টেবলের একধারে পা ঝুলিয়ে বসল।

বাসু তার ঠিক পরের ভাই। বাড়ে চর্বি নেই চেহারায়; স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গায়ের রঙ অবশ্য কালো, কিন্তু কাঁধ চ্যাটালো, মোটা মোটা হাড়, শক্ত চোয়াল, জামাটামার তলায় তার সতেজ উরু এবং বুকের আভাস টের পাওয়া যায়।

একসময় ভাল ফুটবল খেলত বাসু; কলেজ টীমে চার বছর লেফট আউটে খেলেছে। ময়দানে যারা সেকেণ্ড ডিভিসন লীগ খেলে তেমন দু-একটা ক্লাব থেকে ওর ডাক এসেছিল; বাসু যায়নি। লেখাপড়ায় খুব একটা খারাপ ছিল না; সে স্কুল-কলেজের সব পরীক্ষাতেই মাঝারি রেজাল্ট করে গেছে। একবারও কোন সাবজেক্টে ফেল করেনি। এক জাতের ছেলে আছে দারুণ ভাল বা দারুণ খারাপ হিসেবে যারা কোনদিনই নজরে পড়ে না, বাসু ছিল সেইরকম। বরাবর মাঝামাঝি একটা জায়গাতেই সে ছিল। কখন সে বাড়ি আসত, কখন সে কলেজে যেত কিংবা পড়াশোনা করত অথবা প্র্যাকটিশ করতে মাঠে নামত—সবই চোখে পড়ত কিন্তু মনে তেমন দাগ কাটত না। ওর সম্বন্ধে বাড়ির, শুধু বাড়ির কেন, এই রানীবাজারের সবাই ছিল অনেকটা অমনোযোগী।

শেষ পর্যন্ত বাসু—অত্যন্ত মাঝারি, বিশেষত্বহীন, এ দেশের ঝাঁক ঝাঁক অতি সাধারণ যুবকের একজন—এমন এক কাণ্ড করে বসল যাতে গোটা রানীবাজার চমকে উঠেছিল। কনভোকেসনের সময় আরো কয়েকটি ছেলের সঙ্গে 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই—' চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে গোটা রানীবাজারের চোখ ওর দিকে।

বি-এ পাশ করার পর কিছুদিন চাকরি-টাকরির জন্য এখানে ওখানে ছোটাছুটি করেছে বাসু। না পেয়ে এখন রাতের ট্রেনে আরো ক'টি ছেলেকে জুটিয়ে ছেনতাই করে বেড়ায়। কাজটা দারুণ বিপজ্জনক। বাসুকে অনেক বার বারণ করেছে অমিত, প্রচুর বুঝিয়েছে। বাসু মেনে নেয় নি, বেপরোয়া হেসেছে শুধু। 'যা হবার হোক' এমন একটা ভাব তার।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না বাসু, দিনরাত কোথায় কোথায় ঘোরে। কখন সে আসবে, কখন আবার হুট করে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ওর কথা যখনই অমিত ভাবে নার্ভগুলো দপদপ করতে থাকে ; অসহ্য যন্ত্রণা ঢেউয়ের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। তার ভয়, বাসুটা একদিন না একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই কিংবা তার অন্য কোন বিপদ হবে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে অমিত জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, সকালবেলা হঠাৎ হাজির যে—'

বাসু বলল, 'একটু দরকার আছে।'

'বল—'

'তুমি কি আজ বেরুবে ? মানে কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

অমিত একটু ভাবল। তারপর আলস্যের হাই তুলে বলল, 'না। আজ বাড়িতেই থাকছি। কেন ?'

'আমার ট্রাউজার আর জ্যাকেটটা যদি দাও—'

অমিতের মনে পড়ে গেল, কাল বাসু এবং সানুর জুতো-জামা-

টামা পরে সে কলকাতায় গিয়েছিল। ব্যস্তভাবে ব্র্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, 'ওই তো রয়েছে, নিয়ে নে—'

ব্র্যাকেট থেকে ট্রাউজার আর জ্যাকেটে নামিয়ে আবার টেবলে গিয়ে বসল বাসু। বলল, 'তোমার দরকার হলে আবার নিও—'

'আচ্ছা—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বাসুই বলল, 'কাল যে জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলে তার কিছু হল ?'

কাল থেকে বাসুকে নিয়ে এই প্রশ্নটা তিনজন করল। মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল অমিত অর্থাৎ হয়নি।

বাসু টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। বলল, 'ও হবে না, আমি জানি। ইউজলেস তুমি ঘুরছ দাদা—'

অমিত চুপ।

বাসু আবার বলল, 'ন বছর তো কত শালাকে ধরলে, ঘুরে ঘুরে হাঁটুর কব্জা ঢিলে করে দিলে, চাকরি হল ?'

অমিত এবারও উত্তর দিল না।

বাসু বলতে লাগল, 'ওসব চাকরি-বাকরির আশা ছেড়ে দাও।'

অমিত বলল, 'কী করব তা হলে ?'

সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে বাসু বলল, 'আমার কথা শুনবে ?'

'কি ?'

'তুমি আমার গ্রুপে এসো, টু পাইস হয়ে যাবে।'

গলা শুকিয়ে আলজিভ পর্যন্ত খরখরে বালির মতো হয়ে গেল অমিতের ; ঢোক গিলে সে বলল, 'মানে ছেনতাই—'

বাসু হাসল, 'ছেনতাইটা শুনতে খারাপ—ভেরি ব্যাড। ধরো না কারো কারো সারপ্লাস জিনিস আমরা নিচ্ছি। অবশ্য সহজে দিতে চায় না ; বুকের কাছে তখন ড্যাগার ফ্যাগার ধরতে হয়। স্রেফ ভয় দেখানোর ব্যাপার ; তার বেশি কিছু না।' বলতে বলতেই হুম করে কি মনে পড়ে যেতে থেমে গেল। দু-তিন সেকেণ্ড

অমিতের মুখচোখের রক্তশূন্য ভীত ফ্যাকাশে ভাবটা লক্ষ্য করে আবার বলল, 'ধুস, কাকে কী বলছি। তোমার তো আবার উইক নার্ভ : শুনেই হার্টফেল করে ফেলছ। এ্যাকসনের সময় যে কি করবে! হোপলেস! আচ্ছা আমি এখন যাই—' বাসু আর বসল না, বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বাসু যাবার পরও বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। এই শীতের সকালেও গলগল করে ঘেমে নেয়ে উঠেছে অমিত। ঘাড়ের কাছে সেই ব্যথাটা আবার টের পাওয়া যাচ্ছে।

বসে থাকতে থাকতেই অমিত শুনতে পেল, মিতু ডাকছে—'বড়দা নিচে এসো। চা হয়ে গেছে।'

অমিত বিছানা থেকে নেমে একটা মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর মাজনের কৌটো থেকে খানিকটা ধোঁয়া রংয়ের পাউডার বাঁ হাতের চেটোয় ঢেলে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাইরে জলের ড্রামটার কাছে গেল। মুখটুখ ধুয়ে একটু বাদে নিচে চলে এল।

নিচের এই ঢালা চওড়া বারান্দাটায় শীতকালে প্রচুর রোদ আসে। অমিত দেখতে পেল, ওধারে কালকের সেই চেয়ারটায় পোকায়-কাটা পুরনো একটা বালাপোষ গায়ে দিয়ে বাবা রোদ পোয়াচ্ছে, হাতে চায়ের কাপ। এধারে রান্নাঘরের দিকটায় মা, মিতু আর বাসু। সানুকে দেখা গেল না। হয়তো সে এখনও ওঠে নি কিংবা উঠলেও বেরিয়ে টেরিয়ে গেছে। রোজই সকালে অমিতদের এই বারান্দায় পারিবারিক চায়ের আসর বসে।

বাসুরা যেখানে বসে আছে সেদিকে যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে বাবাকে দেখল অমিত। চোখাচোখি হল, বাবা অবশ্য কিছু বলল না। অমিতও কিছু বলল না, সোজা বাসুদের কাছে চলে এল। মিতু তার হাতে চায়ের কাপ আর কড়কড়ে একটা টোস্ট বিস্কুট তুলে দিল।

বাসুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সামনের আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ও বাড়ির বাইরে চলে গেল।

আর চায়ে চুমুক দিতে গিয়েই আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল অমিতের, সানুকে দেখা যাচ্ছে না। কাল রাত্তিরে সুরেশ্বরের গিরিধারী ট্রেডার্সে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে, এখনও জানা যায় নি। সুরেশ্বর যে রকম লোক সানুকে কোন বিপদে ফেলে নি তো? অবশ্য মা-বাবা কিংবা মিতুর মুখটুখ দেখে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কোন রকম ঝামেলা টামেলা হলে নিশ্চয়ই টের পাওয়া যেত। তবু সানুর ব্যাপারে কি রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে অমিতের। সানুর কথা মা কিংবা মিতুকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, সেই সময় দেখা গেল সে সামনের জঙ্গলের ওপাশে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে। বাথরুম আর কি, ফুটিফাটা টিন দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গা, ভেতরে টিউবওয়েল আছে, বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে, মাথার ওপর এ্যাসবেস্টসের ছাউনি।

সানু সোজা অমিতদের কাছেই চলে এল। মিতু তার হাতে ভাগের চা আর টোস্ট বিস্কুট দিল। লম্বা চুমুকে কাপের আধাআধি শেষ করে আরামে চোখ বুজল সানু। তারপর বিস্কুট চিবুতে শুরু করল।

অমিত সানুকে লক্ষ্য করছিল। দূরমনস্কর মতো এক ঢোক চা খেয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'এ্যাই সানু—'

সানু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অমিত কাছে এগিয়ে এসে আগের মতো গলা করে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কী হল রে?'

সানু বুঝতে পারে নি। একটু অবাক হয়ে বলল, 'কিসের কথা বলছ?'

'সুরেশ্বরকাকার।'

ঠোঁট কুঁচকে গলায় ভেতর তাচ্ছিল্যের শব্দ করল সানু, কিছু বলল না।

অমিতের উৎকণ্ঠা সবটা কাটে নি। সে বলল, 'সুরেশ্বরকাকা গোলমাল টোলমাল করে নি তো ?'

'কী গোলমাল করবে ?'

'ওই যে বলছিল পুলিশে ডাইরি করবে তোর নামে—'

দ্রুত ঘাড় ফেরাল সান্নু। পুরোপুরি চোখ মেলে অমিতের দিকে তাকাল। তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল, আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল। বলল, 'পুলিশে ডাইরি করবে! ওই শালা!' বলেই চ্‌ক্ করে গালের ভেতর একটা আওয়াজ করল।

অমিত কী বলবে ভেবে পেল না, সে তাকিয়েই থাকল।

সান্নু আবার বলল, 'আমিও তো ওকে বলেছিলাম, যাও না আমার নামে ডাইরি কর। তুমি হারামী কতটা খেলতে পার, আমি একবার দেখি। শালা থানায় ফোন করবে বলে টেলিফোন তুলতে যাচ্ছিল—'

'তারপর ?'

মজার মুখ করে সান্নু বলল, 'তারপর কী হল তুমিই বল না—'

অমিত ওর মুখটুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। বিমূঢ়ের মতো বলল, 'কী হল ?'

'সুরেশ্বর পালিতের মাথায় নাইট্রিক এ্যাসিড ঢেলে দিলাম—'

অমিত চমকে উঠল, 'কী বলছিস সান্নু—নাইট্রিক এ্যাসিড!'

সান্নু হেসে ফেলল, 'ঘাবড়ে গেছ তো ? আরে বাবা আসল এ্যাসিড না—'

'তবে ?'

'বললাম, শালা সুরেশ্বর, তুমি যদি থানায় ডাইরি কর, আমিই তোমার নামে ডাইরি করতে থানায় যাব। বুঝলে দাদা, তাতেই না লোকটার তড়পানি কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। জামা-টামা শ্রিঙ্ক করে দেখেছ তো ?'

অমিত মাথা হেলিয়ে দিল, দেখেছে।

সান্নু বলতে লাগল, 'রানীবাজারের গ্রেট সুরেশ্বর পালিত তেমনি শ্রিঙ্ক করে এইটুকুন হয়ে গেল—' হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোট মাপ দেখাল সে। একটু থেমে আবার বলল, 'কিছু বুঝলে ?'

এবারও মাথা নাড়ল অমিত, বোঝে নি।

সান্নু হেসে হেসে বলল, 'ওকে বললাম তুমি হারামী বেবি ফুড আর কেরাসিন যে ব্ল্যাক কর তা আমরা জানি। কোথায় কার কাছে বেশি দামে ঝাড়ো—সব পুলিশকে বলে দেব। এখন বল তুমি থানায় যাবে, না আমি ? তখন সুড়সুড় করে সরস্বতী পুজোর চাঁদা ছু'খানা বড় পাত্তি বার করে দিলে।'

অর্থাৎ দুশোটা টাকাই আদায় করে ছেড়েছে সান্নু। অমিত বলল, 'পরে সুরেশ্বরকাকা তোর কোন ক্ষতি করবে না তো ? লোকটা ভাল না—'

'দুশোটা টাকা এমনি এমনি কেউ দ্যায় ? তবে লোকজনের সামনে ওকে রগড়ে দিয়েছি। সুরেশ্বর পালিত আমাকে সহজে ছাড়বে না।'

'কেন এসব করতে যাস সান্নু ?'

'তুমি টেরিফিক ভীতু দাদা। চাকরি-বাকরি নেই, কোনদিন হবেও না। এভাবে ছেনতাই করে না নিলে আমাদের চলবে কি করে ? এর জন্যে আমার যদি কিছু হয় তো হবে, ও সব আর ভাবি না।' বলতে বলতে সান্নু ওঠে পড়ল। তারপর সিঁড়ির বাঁ দিকে তার ঘরটায় চলে গেল।

অমিত লক্ষ্য করে নি, সান্নুর সঙ্গে সে যখন কথা বলছিল সেই সময় মা আর মিতু কখন যেন রান্নাঘরে চলে গেছে। বারান্দার এদিকটা এখন একেবারে ফাঁকা, শুধু ওদিকের শেষ মাথায় ভাঙা চেয়ারে বসে বাবা শীতকালের নরম রোদের তাপে চৌষট্টি বছরের ঠাণ্ডা নিস্তেজ শরীরটাকে সেঁকে নিচ্ছে। হাতের ভর দিয়ে অমিত উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে গেল ; সে ছাদে যাবে।

॥ সাত ॥

দু-তিন দিন বাড়ি থেকে আর বেরুল না অমিত। এমনিতেই সে চুপচাপ শান্ত ধীর প্রকৃতির ছেলে। খানিকটা অন্তর্মুখীও। দীর্ঘ বেকারিত্ব তাকে ঘিরে এক ধরনের গাঢ় বিষণ্ণতাও এনে দিয়েছে। ছেলেবেলায় দুর্দান্ত ভোগার জন্য মন বা শরীর, সব দিক থেকেই সে দুর্বল, কমজোরী। জোরে জোরে উচ্চকণ্ঠে হাসবে কিংবা হৈ হৈ করে সময় কাটিয়ে দেবে—এতটা জীবনীশক্তি তার নেই। সে খানিকটা নিঃসঙ্গ, একাকী।

দু-তিনটে দিন ছাদের ঘরেই একা-একা কাটিয়ে দিল অমিত। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে এই নিরিবিলি ঘরটা তার আশ্রয়। অবশ্য স্নান খাওয়া ইত্যাদির জন্য তাকে নিচে নামতে হয়।

এই দু-তিন দিনে মোট বারদশেক একতলায় নেমেছে অমিত। বাকি সময়টা পুরনো ম্যাগাজিন, দশ বার করে পড়া কবিতার বই, এই সব পড়েছে। বাড়িতে একখানা খবরের কাগজ আছে। সেটা এনে অভ্যাসবশত চাকরি খালির জায়গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বাকি সময়টা আকাশের দিকে বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে শুয়ে থেকেছে। কখনো সখনো মাথার দিকের জানালাটা খুললে নীলাদের বাড়িটা চোখে পড়েছে। কিন্তু নীলা বা ওদের বাড়ির কারো সঙ্গেই একবারও দেখা হয়নি। নীলাদের বাড়ির এদিককার জানলাগুলো সব সময় বন্ধ থাকে। তা ছাড়া ওরা কেউ ছাদেও ওঠে না; তাই দেখা হওয়া সম্ভব না।

তিন দিন পর অমিত ঠিক করল একবার কলকাতায় যাবে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করা দরকার। তা ছাড়া ব্র্যাবোর্ণ রোড আর ক্লাইভ স্ট্রীটের ক'টা অফিসেও যেতে

হবে। তার চেনাশোনা লোকেরা ওখানে কাজ করে, যদি কোনরকম চাকরির খোঁজটোজ পাওয়া যায়। অনবরত আশার পেছনে ছুটে চলা—এই আর কি।

যেদিন সে কলকাতায় যায় সকালেই বেরিয়ে পড়ে। আজও মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা আর সান্টু বাবুর জামাটামা চেয়ে নিল অমিত। তারপর আলুসেদ্ধ-ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেল।

এখন ন'টার মতো বাজে। দশটা কুড়িতে কলকাতার একটা ট্রেন আছে। তাদের বাড়ি থেকে স্টেশন দু-আড়াই মাইল। যত আস্তেই হাঁটুক এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে ঠিক পৌঁছে যাবে। মেরু-দণ্ডের মতো সেই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগল সে।

স্টেশনে এসে অমিত দেখল, আধ ঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেছে। আজ দারুণ ভিড় ছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কাটল সে; তারপর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নীলাকে মনে পড়ে গেল। স্টেশনে এলে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যদিও এখন দেখা হবার কথা নয়, কেননা নীলা ফেরে সকালের দিকের ট্রেনে তবু অভ্যাসবশত একবার ওধারের প্ল্যাটফর্মে, ওভারব্রিজে, ওয়েটিং রুমের কাছটায় একবার দেখে নিল অমিত। না, নীলা নেই।

একটু পর কলকাতার ট্রেন এসে গেল।

রাস্তায় সিগন্যালে কি গোলমাল ছিল। ট্রেনটা আধ ঘণ্টা লেট করে শেয়ালদা নর্থে পৌঁছুল সাড়ে এগারোটায়। সেখান থেকে ভিড়ের ট্র্যামে ঝুলে ঝুলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আসতে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সোজা গাঙ্গুলির ঘরে চলে এল সে।

গাঙ্গুলির বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। গোলগাল ভারী চেহারা, টকটকে ফর্সা রঙ, পুরু গোঁফ, চুল পাতলা, গোল থুতনি, মোটা ঠোঁট। কয়েক বছর যাতায়াতের ফলে গাঙ্গুলির সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে। অমিতকে বসিয়ে গাঙ্গুলি বলল, 'এবার অনেকদিন পর এলেন।'

অমিত বলল, 'হ্যাঁ, ভাল আছেন স্যার—'

'ওই এই রকম। আপনি?'

'ন' বছর আগে বি. এস-সি পাশ করেছি। তারপর থেকে বেকার। আমার কিরকম থাকা উচিত বলুন—'

গাঙ্গুলি দুঃখিত স্বরে বলল, 'আই নো, আই নো—'তার মুখটা সহানুভূতিতে কোমল দেখাল। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'কোথাও কিছু হল না?'

গাঙ্গুলি ঠিক এতটা সহানুভূতিশীল নয়। হয়তো অমিতের একটানা বেকারত্ব তাকে বিচলিত করেছে। অমিত বিষণ্ণ হাসল, 'না, হল আর কই। আমি আপনার ভরসাতেই আছি। এবার স্যর কিছু করে দিন, আর পারছি না।'

গাঙ্গুলি বলল, 'সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবার অনেক লোক নেবে কিন্তু মুশকিল হয়েছে আপনার বয়েসটা নিয়ে—'

অমিত তা জানে। গভর্নমেন্ট সার্ভিস তার হবে না: বয়েস পেরিয়ে গেছে।

গাঙ্গুলি বলতে লাগল, 'এজটা ঝামেলা না করলে একটা কিছু এবার হয়ে যেত। অবশ্য হুগলী আর বর্ধমানে ক'টা নতুন ফ্যাক্টরি হচ্ছে, শুনলাম। ওরা জানালেই আপনার নামটা ফার্স্ট পাঠিয়ে দেব।'

'নমস্কার স্যর, আজ চলি।' চেয়ার থেকে নিজেকে টেনে তুলল অমিত।

'নমস্কার—' হঠাৎ কি মনে পড়তে গাঙ্গুলি বলল, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে সেই যে মেয়েটি আসত—কি যেন নাম?'

'নীলা মুখার্জি—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাকে তো আজকাল দেখি না। সে কি কোন কাজ পেয়ে গেছে?'

হাড়ের ভেতর হঠাৎ ধাক্কা অনুভব করল অমিত। জড়ানো গলায় বলল, 'না—মানে আমি ঠিক জানি না।'

'ও—'

অমিত গাঙ্গুলির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। এই ছেলেটির সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল ; টালিগঞ্জের ওধারে কি একটা জবর দখল কলোনিতে থাকে। কম্পার্টমেণ্টালে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে, তারপর আর পড়তে পারে নি, চাকরির জন্য চারদিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। রোগা কালো অপুষ্ট চেহারা প্রশান্তর, প্যাণ্ট জামায় দু-একটা তালি চোখে পড়ে। দেখেই বোঝা যায় সপ্তাহে কম করে দু'দিন খাওয়া জোটে না, তবু হাসিটি ঠিক আছে।

প্রশান্ত বলল, 'দাদার কিছু কাজটাজ হল ?'

'না ভাই।'

'আমাদের কিচ্ছু হবে না। কত লোককে যে মোবিল লাগাচ্ছি কিন্তু কেউ ভিজছে না।'

অমিত হাসল। বলল, 'আজ যাই ভাই, পরে আবার দেখা হবে।'

'ও-কে দাদা—'

ওল্ড কোর্ট হাউস ধরে হাঁটতে হাঁটতে নেতাজী সুভাষ রোডে এসে পড়ল অমিত। সেখান থেকে ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ, ব্রাবোর্ণ রোড, নিউ সি-আই-টি রোড—দু ডজনের মতো অফিসে ঘোরাঘুরি করল। সব জায়গায় এক কথা—'নো ভ্যাকান্সি।'

নিউ সি-আই-টি রোডের শেষ অফিসটা থেকে বেরিয়ে অমিত দেখল শীতের বেলা মরে আসছে। রোদের গায়ে এখন বাসি হলুদের রঙ। বাতাসে টান ধরতে শুরু করেছে। জলস্রোতের মতো মানুষ ট্র্যাম-বাস-প্রাইভেট কার-রিকশা ইত্যাদি রবীন্দ্র সরণির বুকচাপা সরু রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। শ্রান্ত অমিত সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে এ সবের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। একসময় সে এসপ্ল্যানেডে এসে গেল।

ওধারের একটা বড় বাড়ির মাথায় টাওয়ার-ক্লকে এখন চারটে বেজে সতের। ঘড়িটা দেখতে দেখতে কোন কার্যকরণ হয়তো নেই তবু হঠাৎ সতীর কথা মনে পড়ে গেল অমিতের। সেদিন সতী বার বার বলেছিল কলকাতায় এলে অমিত যেন তাদের বাড়ি যায়। সে গেলে ওরা খুব খুশী হবে।

যাবে কিনা অমিত একবার ভাবল। ভেতরে ভেতরে অনুভব করল, সতীদের বাড়িটা দুরন্ত আকর্ষণে টানছে।

সেই দুপুর থেকে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় গোটা ডালহৌসি পাড়াটা চষে বেড়িয়েছে অমিত। দারুণ খিদে পেয়েছিল। চট করে ওপাশের গলিটায় একটা সস্তা চায়ের দোকানে ঢুকে ভেজিটেবল চপ আর চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রিটজ হোটেলের সামনের বাস স্টপে এসে দাঁড়াল। একটু বাদেই একটা নীল রঙের এল-টু বাস এসে গেল। দুর্দান্ত ভিড়। কলকাতা নামে এই শহরে সকাল-দুপুর-মধ্যরাত, কোন সময়েই ট্র্যাম-বাসে ছ ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা পাওয়া যায় না।

দূরের টাওয়ার ক্লকটা আরেকবার দেখল অমিত। আরো কুড়ি মিনিট সময় পার হয়েছে। অর্থাৎ এখন চারটে সাঁইত্রিশ। একটু পরেই অফিস-টফিস ছুটি হয়ে যাবে। এই বাসটা ছাড়লে তখন আর ওঠা যাবে না। কোনরকমে ফুটবোর্ডে অসংখ্য পায়ের জঙ্গলে নিজের একটা পা ঢুকিয়ে রড ধরল অমিত। নশ্বর শরীরের বেশির ভাগটাই বাইরে বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে রইল।

গড়িয়াহাটার মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে অমিত যখন সতীদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে পৌঁছল, শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

বাড়িটা দোতলা ; চার-পাঁচ বছর আগের মতোই প্রায় আছে। দরজা, জানালা এবং দেয়াল-টেয়ালে নতুন রং করা হয়েছে। টাটকা পেইন্ট আর চুনের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

বাড়িটার সামনের দিকে লোহার গেট। গেটের ওধারে ক'টা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেই চৌকো চৌকো সাদা পাথর-বসানো বারান্দা। তার গায়েই ভেতরে যাবার দরজা। আড়াই ইঞ্চি পুরু কাঠের এই দরজাটা যেমন মজবুত তেমনি সুন্দরও, ওটার মাথায় রঙীন কাঁচ লাগানো।

সতীর বাবা যুদ্ধের সময় এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন। সতী বা জ্যোতির্ময় কারো তখন জন্মই হয় নি। অমিতের মনে আছে, চার-পাঁচ বছর আগে সতীরা এ বাড়িটার ভাড়া দিত মোটে একশো দশ টাকা। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগে বলে ভাড়াটা এত সস্তা। নইলে সাউথ ক্যালকাটার এ দিকটায় এরকম বাড়ি আট-নশো টাকার কমে এখন পাওয়া যায় না।

গেট খুলে বারান্দায় উঠল অমিত। দরজার পাশের কলিং বেলটা খুঁজে নিয়ে আঙুলের চাপ দিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল। অমিত দেখল, সতী তার সামনে দাঁড়িয়ে। কয়েক পলক সতীর দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'চলে এলাম—'

ঘিয়ের বাতি থেকে যেরকম কোমল আলো বেরোয় তেমনি আভা ধীরে ধীরে সতীর চোখের তারায়, ঠোঁটে, চিবুকের খাঁজে ছড়িয়ে যেতে লাগল। নরম গলায় সে বলল, 'আসুন—'

ভেতরে ঢুকেই বসবার ঘর। এ ঘরটা চমৎকার সাজানো। দামী পর্দা, সুদৃশ্য সোফা, সেণ্টার টেবল, ডিভান, উঁচু স্ট্যাণ্ডে এ্যাকুয়েরিয়াম, ডিসটেম্পার করা দেয়ালে পিকাসোর ছবির প্রিণ্ট, মেঝেতে কার্পেট। চার-পাঁচ বছর আগে এত সাজসজ্জা ছিল না।

সতী ভেতরে ডেকে এনেছে তবু অমিত নিজের মধ্যে এক ধরনের অকারণ স্নায়ুভয় টের পাচ্ছিল। বলল, 'বলেছিলাম আসব, ঠিক এসেছি।'

সেই হাসিটা সতীর মুখে লাগানোই ছিল। সে বলল, 'তাই

তো দেখছি। আপনি একটু বসুন ; মা-বাবাকে খবর দিয়ে আসছি।' সতী পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অমিত একটা সোফায় বসল। উঁচু স্ট্যাণ্ডের মাথায় এ্যাকুয়েরিয়ামে লাল নীল মাছের ছোটাছুটি দেখতে দেখতে সে ভাবতে লাগল, সতীর কথায় হুট করে এই যে সে চলে এল, ওর মা-বাবা আবার কিছু ভাববে না তো ? এভাবে আসাটা বোধহয় ঠিক হয় নি।

একটু পর সতী আবার এল। বলল, 'আসুন—'

অমিত উঠে দাঁড়াল, 'কোথায় ?'

'মা-র ঘরে।'

অমিত জানে পুরো একতলাটা সতীদের। এখানে সবসুদ্ধ পাঁচখানা ঘর। চার-পাঁচ বছর আগে একটা ঘর ছিল জ্যোতির্ময়ের, একটা সতীর, একটা ওর মা-বাবার, একটা বসবার ঘর। বাকিটা স্টোর, নানারকম টুকিটাকি জিনিসে বোঝাই। এ ছাড়া কিচেন, বাথরুম ডাইনিং প্লেস। তার ধারণা আগেব মতোই সব ব্যবস্থা রয়েছে।

সতীর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে অমিতের মনে হল, আগের তুলনায় চারদিক অনেক বেশি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন, অনেক বেশি সাজানো-গোছানো। জ্যোতির্ময় ব্রিটিশ ফার্মে চাকরিটা ভালই করে মনে হচ্ছে।

সতীর মায়ের ঘরে আসতে দেখা গেল, ওর বাবাও এ ঘরেই আছেন। একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। হাতে মোটা একখানা বই ; মূল সংস্কৃত থেকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ। সতীর মা তাঁর পাশেই পুরনো আমলের কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড ভারী খাটে শুয়ে আছেন। খুব সম্ভব সতীর বাবা প্রবোধেন্দু সান্যাল তাঁকে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

প্রবোধেন্দু অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির একটা সেকশনে ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। সাত-আট বছর আগে রিটায়ার করেছেন। এখন

বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্বাস্থ্যবান মানুষ। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ভেতরটা ফাঁপা; শরীরে সারবস্তু তেমন কিছু নেই। সতীর মায়ের বয়স সাতান্ন-আটান্ন। চাব-পাঁচ বছর আগেও শরীরের চমৎকার বাঁধুনি ছিল তাঁর। টুকটুকে ফর্সা রং, লম্বা চেহারা, নাকমুখ ধারালো। এখন আর ভদ্রমহিলাকে চেনাই যায় না। গায়ের রং জ্বলে গেছে, স্বাস্থ্য বলতে কিছুই নেই, হাড়ের ফ্রেমের ওপর পাতলা চামড়াটাই যা জড়ানো রয়েছে। দেখেই বোঝা যায় প্যারালিসিস।

অমিত এগিয়ে গিয়ে সতীব মা-বাবাকে প্রণাম কবল। তাবপর নার্ভাস গলায় বলল, 'ক'দিন আগে সতীর সঙ্গে বাস্তায় দেখা। ও আসতে বলেছিল, তাই—'

প্রবোধেন্দু হাসলেন, 'না বললে নিশ্চয়ই আসতে না। তুমি আমাদের একেবারেই ভুলে গেছ অমিত।'

অমিত এবার খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বলল, 'না মেসোমশাই, নানা ঝামেলায়—'

প্রবোধেন্দু এবার বললেন, 'ও কি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—'

অমিত বিশাল খাটেব একধারে আলগোছে বসে পড়ল। দূরে দরজার কাছে সতী দাঁড়িয়ে আছে। অমিত বলল. 'আপনারা কেমন আছেন মেসোমশাই?'

'খুব ভাল। আমার ডায়বেটিস, হাই সুগার। তোমার মাসিমার স্ট্রোক হয়ে গেছে; এখন প্যারালিসিসের মতো—' বলে প্রবোধেন্দু হাসলেন, 'বুড়োবুড়ি চমৎকাব আছি, তাই না?'

অমিতের মনে পড়ে গেল, সতীর কাছেই সেদিন এই খারাপ খবরগুলো জেনেছে। বিষণ্ণভাবে সে একবার প্রবোধেন্দুর দিকে তাকাল; কিছু বলল না।

প্রবোধেন্দু আবার বললেন, 'আমদের কথা থাক। অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম, এখন কী করছ বল?'

সতীও সেদিন এই প্রশ্নটা করছিল ; অমিত আবছা একটা উত্তর দিয়েছিল। আজ স্পষ্ট বলল, 'কিছুই না মেসোমশাই। ন' বছর ধরে যা করছিলাম তাই করছি—চাকরি খুঁজে যাচ্ছি।'

আন্তরিক দুঃখের গলায় প্রবোধেন্দু বললেন, 'ভেরি স্যাড—'

ওধার থেকে সতীর মা বললেন, 'তোমাদের বাড়ির খবর কী অমিত? মা-বাবা ভাল আছেন?' তাঁর গলার স্বর জড়ানো; খুব সম্ভব পক্ষাঘাত তার কণ্ঠস্বরকে আক্রমণ করেছে।

অমিত বলল, 'ওই একরকম—'

কথাবার্তার মধ্যেই অমিত লক্ষ্য করছিল সামনের বারান্দা দিয়ে একটি মেয়ে, সতীর বয়সীই হবে, তিন চার বার হেঁটে গেল। সে যে তাকে দেখবার জন্যই আসছে যাচ্ছে, অমিত বুঝতে পারল। হঠাৎ তার মনে হল এ-ই হয়তো উষা—জ্যোতির্ময়ের সাউথ ইণ্ডিয়ান স্ত্রী।

সতীর মা আবার বললেন, 'তোমার দুটো ভাই ছিল না?'

অমিত বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তারা কী করছে?'

অমিতের অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল, 'তেমন কিছু না—'বলেই ভাবল এবার নিশ্চয়ই মিতুর প্রসঙ্গ উঠবে।

কিন্তু না, আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না সতীর মা : শুধু বুক ফাঁকা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

প্রবোধেন্দু এবার বললেন, 'রুগীর ঘরে থেকে কী হবে। যাও, সতী আর বৌমার সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। জ্যোতির বিয়ের সময় তুমি বোধহয় আসো নি।'

বিয়েতে জ্যোতির্ময় যে নেমন্তন্ন করে নি সেটা আর বলল না অমিত। শুধু বলল, 'আজ্ঞে না—'

প্রবোধেন্দু বললেন, 'বৌমাকে তা হলে তো দেখই নি।' সতীর দিকে ফিরে বললেন, 'বৌমার সঙ্গে অমিতের আলাপ করিয়ে দিস—'

সতী বলল, 'আচ্ছা—'

'ওকে চা দিয়েছিস?'

'না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো এখানে নিয়ে এলাম।'

'চা আর খাবার-টাবার যা আছে দিস—'

'দেব।'

অমিতকে নিয়ে আবার বাইরের ঘরে এল সতী। তাকে বসিয়ে একটু পর পাতলা চেহারার একটি তরুণীকে নিয়ে এল। একেই কিছুক্ষণ আগে সতীর মা-বাবার ঘরের সামনে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে অমিত। সতী আলাপ করিয়ে দিল, 'আমার বৌদি—ঊষা। আর ইনি অমিতদা, দাদার বন্ধু—'

অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার।'

ঊষাও দুই হাতে বুকের কাছে জোড়া করে বলল, 'নমস্কার; বসুন।'

অমিত বসল। মুখোমুখি আরেকটা সোফায় ঊষা আর সতী পাশাপাশি বসল।

ঊষা সতীর বয়সীই হবে। গায়ের রং দারুণ ফর্সা, তার সঙ্গে উজ্জ্বল হলুদ আভা মাখানো। সাউথ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এমন রং বেশি দেখা যায় না। মুখ লম্বাটে, অনেকটা ডিমের মতো। ত্বক মসৃণ, টান টান। দীর্ঘ নাকটা কপাল থেকে নেমে এসেছে, গোল নিভাঁজ গলা, পাতলা ঠোঁট। ঊষার সব আকর্ষণ তার চোখে; এমন গভীর কালো চোখের মণি ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়। ঘন চুলের মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথি। সেখানে সিঁদুরের রেখা, কপালে সিঁদুরের ছোট্ট বিন্দু। একটা সোনালী তাঁতের শাড়ি বাঙালী মেয়েদের মতো আটপৌরে ঢং-এ পরা। হাতে দুটো করে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, নাকে দক্ষিণীদের মতো হীরে-বসানো সোনার ফুল। ঊষা বলল, 'ঠাকুরঝির কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

অমিত সতীর কাছে সেদিনই শুনেছে, উষা তার বন্ধু। লক্ষ্য করল, সতীর নামটা সে বলে নি, তার জায়গার ঠাকুরঝি বলেছে। মনেপ্রাণে মেয়েটা বাঙালী হতে চাইছে। অমিত হেসে বলল, 'ও, তাই নাকি—'

'আপনি তো আগে এ-বাড়িতে প্রায়ই আসতেন—'

'হ্যাঁ।'

'তারপর আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? বন্ধুব ওপব রাগঠাগ হয়েছে নাকি?'

• বন্ধু মানে সতীর দাদা জ্যোতির্ময়। বিব্রতভাবে অমিত বলল, রাগ হবে কেন, মানে—' সে বলতে পাবল না, জ্যোতির্ময়ের চাকবির পর কি দারুণ ফ্রাসট্রেসন যে তাকে পেয়ে বসেছিল! সেই জন্যই সে আসত না।

উষা হাসল, 'সে যাক, এবাব থেকে কিন্তু আসতে হবে।'

'আসব।'

সতী বলল, 'কি অমিতদা, বৌদিকে দেখে সাউথ ইণ্ডিয়ান মনে হয়?'

যে কোন বাঙালীর মতোই উষা পরিষ্কার বাংলা বলে। জলের মতোই সেটা স্বচ্ছ, জড়তাহীন। তার ব্যবহার আচরণ অবিকল বাঙালী মেয়েদের মতোই। এ ব্যাপারে উষা দারুণ সতর্ক।

উষা বা সতীর মধ্যে এমন এক ধরনের আন্তরিকতা এবং সারল্য বয়েছে যাতে অমিত ক্রমশ সহজ হয়ে আসছিল; তাব আড়ষ্টতা এবং স্নায়ুভয়, দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। হেসে হেসে সে বলল, 'একেবারেই না।'

উষা বলল, 'বাঙালী ছেলে বিয়ে করেছি; আমাকে বাঙালী তো হতেই হবে, না কি বলেন?'

অমিত বলল, 'নিশ্চয়ই।'

সতী বলল, 'জানেন অমিতদা, বৌদি শিবরাত্রির উপোষ করে,

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে যায়। বাঙালী মেয়েরাও এত সব পারে না।'

অমিত হাসতে লাগল।

সতী একটা নাম করা গানের স্কুলের নাম করে বলল, 'বৌদি ওখান থেকে রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা পেয়েছে।'

অমিত বলল, 'এটা তো একটা দারুণ খবর। একদিন গান শোনাতে হবে কিন্তু—'

উষা লাজুক হাসল, 'ধুর, ঠাকুরঝির কথা শুনবেন না—'

সতী কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে দ্রুত উষার দিকে ফিরল। হাত-টাত নেড়ে বলল, 'তোমাকে একটা কথা জানানোই হয় নি, অমিতদাও দারুণ ভালো গায়। আগে আগে যখন আমাদের বাড়ি আসত পনের ষোলটা করে গান গাইয়ে ছাড়তাম।'

উষা বলল, 'তা হলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি—'

অমিত বলল, 'প্লীজ আজ না। অনেকদিন অভ্যাস নেই। পরে যেদিন আসব সেদিন গাইব। তবে তার আগে আপনাকে আর সতীকে গাইতে হবে।'

সতী বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজী। আপনাদের মতো বড় আর্টিস্ট তো নই, আমাকে অত সাধতে হয় না। কবে আসবেন বলুন, সেদিন বাড়িতে ছোটখাটো একটা ফাংশান করব। আমার দু-চারজন বন্ধুকেও বলব।'

একটু ভেবে অমিত বলল, 'যদি নেক্সট্ সানডে বিকেলে আসি—'

'কোন আপত্তি নেই। ওই দিনটা ফিক্সড রইল।'

'আচ্ছা—'

একটু চুপচাপ। তারপর উষার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সতী সেদিন বলছিল আপনার দুই ছেলেমেয়ে। বাচ্চাদের দেখছি না তো?'

উষা বলল, 'ওরা ওদের মামার বাড়ি গেছে ; আজ রাত্তিরে থাকবে—'

ভেতরের ঘর থেকে হঠাৎ প্রবোধেন্দুব গলা শোনা গেল, 'অমিতকে চা দিয়েছিস সতী ?'

চোখ বুজে জিভে একটা কামড় দিল সতী। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিচু গলায় বলল, 'এই বে, একদম ভুলে গেছি।' তারপর গলা তুলে বলল, 'দিচ্ছি বাবা—'

'এখনও দিস নি ! কি ভুলো মন যে তোদের—' টের পাওয়া গেল, প্রবোধেন্দু বিরক্ত হয়েছেন।

উষাও সোফা থেকে উঠে পড়েছিল। সতীকে বলল, 'তুমি বোসো ঠাকুরঝি ; অমিতদার সঙ্গে গল্প কর। আমি চা নিয়ে আসছি।' সে চলে গেল।

সতী আবার বসল। একটু ভেবে অমিত বলল, 'জ্যোতির বউ বেশ ভাল হয়েছে। চমৎকার মেয়ে।'

সতী ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ, খুব ভালো মেয়ে উষা ; আমাদের ফ্যামিলিতে এসে মানিয়ে নিয়েছে। দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ ওর দারুণ।'

'জ্যোতিটা খুব লাকি।'

সতী কিছু না বলে হাসল।

একটু চুপ করে থেকে অমিত বলল, 'এতদিন বাদে তোমাদের বাড়ি এলাম, সবার সঙ্গে দেখা-টেখা হল, শুধু জ্যোতিটার সঙ্গেই হল না। অফিস থেকে ও কখন ফেরে ?'

অমিত লক্ষ্য করল, তক্ষুনি উত্তর দিল না সতী, ঘন ছায়ার মতো কিছু একটা তার সুন্দর উজ্জ্বল মুখটাকে আচমকা অপরিচিত করে দিল। কিছুক্ষণ পর অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'দাদার ফেরার কিছু ঠিক নেই ?'

তবু অমিত জিজ্ঞেস করল, 'ক'টায় ওর অফিস ছুটি ?'

'সাড়ে পাঁচটায়। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় যায়—'

'ও—'

'আমার কথা জ্যোতিকে বলেছিলে?'

'বলেছি।'

ঊষা একটা ট্রে-তে চায়ের কাপ, সন্দেশ এবং ডালমুটের প্লেট সাজিয়ে এ ঘরে এল।

খেতে খেতে আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প হল। শীতের রাত ক্রমশ বাড়ছিল। ওধারের দেয়ালে সুদৃশ্য মিউজিক্যাল ক্লকটায় এখন আটটা বেজে পনের। ট্রেন-বাস ঠিকঠাক পাওয়া গেলে এখান থেকে শিয়ালদা হয়ে বাড়ি ফিরতে দশটা বেজে যাবে। রানীবাজারের পক্ষে রাত দশটা প্রায় মধ্যরাত। অমিত বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল। আজ উঠি।'

ঊষা বলল, 'সবে সোওয়া আটটা, আরেকটু বসুন না—'

'আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আজ আর বসব না।'

'এতদিন বাদে এলেন; আপনার বন্ধুর সঙ্গেই তো দেখা হল না। আরেকটু বসলে কিন্তু দেখা হয়ে যেত।'

অমিত উঠে দাঁড়াল, 'প্লীজ, আজ আর বসতে বলবেন না—' সে বেরুতে যাবে, বাইরের রাস্তায় একটা গাড়ি এসে থামল। তারপর কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

ঊষা বলল, 'আপনার বন্ধু বোধ হয় এসে গেছে।' ব্যস্তভাবে সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

জ্যোতির্ময়ই এসেছে। একা অবশ্য নয়, সঙ্গে একটি লোক।

জ্যোতির্ময়কে প্রায় চেনাই যায় না। দারুণ মোটা হয়ে গেছে সে। পেটে-গালে-ঘাড়ে—সর্বত্র শুধু চর্বি। চার-পাঁচ বছর আগেও জ্যোতির্ময়কে দেখলে ভাল লাগত। নাকমুখ ধারালো, মেদহীন ঋজু চেহারা, চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা। শরীরের যেসব ধারালো

রেখা মানুষকে আকর্ষণীয় করে, চাপ চাপ চর্বির তলায় সেগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। দেখেই বোঝা যায়, পুরোপুরি এ্যালকোহলিক ফ্যাট। মাঝে মাঝে অমিত ভাবে, জীবনে সাকসেস অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ফ্যাটের গভীর সম্পর্ক রয়েছে ; সেই কথাটা আরেক বার মনে পড়ে গেল।

জ্যোতির্ময়েব সঙ্গীব বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। ডাই-করা চুল। বেশ ভাল হাইট ভদ্রলোকের, পাঁচ ফুট দশ এগারো ইঞ্চি হবে, বিস্তৃত কপাল। চৌকো মুখে থ্যাবড়া থুতনি। মোটা না হলেও বেশ মাংসল শবীর। রঙ পোড়া ব্রোঞ্জের মতো। মজবুত ঘাড়, মোটা মোটা আঙুল। চোখের তারা বাদামী রঙেব, সযত্নে ছাঁটা পুরু গোঁফ, চওড়া জুলপি। গায়ে দামী স্যুট। জুতোদুটো দেখলেই মনে হয় কুমীরের চামড়াব—তেমনই খসখসে, এবড়ো-খেবড়ো।

জ্যোতির্ময় কোনদিকে লক্ষ্য করেনি। তার সঙ্গের লোকটিকে নিয়ে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। একেবারে বিগলিত হয়ে সে বলছিল, 'বসুন স্যব, বসুন—' লোকটি বসলে বলল, 'কী খাবেন স্যর? কফি অব—'

জ্যোতির্ময়ের কথা শেষ হবার আগেই লোকটি বলল, 'নাথিং। আমবা তো এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। যা খাবার বাইরেই খাব—' বলেই পকেট থেকে টোব্যাকো বক্স আর পাইপ বার করল। পাইপে তামাক পুরতে পুরতে আবার বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি সান্যাল—'

'ইয়েস স্যব, দশ মিনিটের ভেতর বেরিয়ে পড়ছি—' বলতে বলতেই জ্যোতির্ময়ের চোখ অমিতের ওপর এসে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'অমিত না?'

অমিত শ্বাসটানার মতো শব্দ করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আফটার এ লং টাইম—'

'হ্যাঁ।'

অমিতের মনে আছে, আগে আগে তাকে দেখলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত জ্যোতির্ময়। তার আজকের কথায় বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই। যেটুকু সে বলেছে, নিতান্তই ভদ্রতাসূচক।

ঊষা পাশ থেকে বলল, 'অমিতদা তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন—'

অন্যমনস্কভাবে জ্যোতির্ময় বলল, 'ও তাই নাকি—' বলেই সতীর দিকে ফিরল, 'স্যর নিজে তোকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছেন। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে—'

চাপা আধফোটা গলায় সতী বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

সতীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল অমিত। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকাল। দেখল সতীর চোয়াল কঠিন, দাঁতে দাঁত চাপা, ঠোঁট শক্তবদ্ধ এবং চোখের তারা স্থির নিষ্পলক।

হুড় হুড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিল জ্যোতির্ময়, তাকে থামিয়ে সেই লোকটি বলল, 'আমার ইচ্ছা আজ রাত্তিরে তুমি জ্যোতির্ময় আর আমি একটা হোটেলে ডিনার খাব।'

সতী উত্তর দিল না।

লোকটি দাঁতে পাইপ চেপে আবার বলল, 'হোটেলে টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছি।'

সতী এবার বলল 'আমাকে ক্ষমা করুন—'

লোকটি বলল, 'প্লীজ—'

জ্যোতির্ময় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'ডোণ্ট বী সিলি সতী, স্যর নিজে এসেছেন—' বলতে বলতেই অমিত সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হল। একটু থেমে তার চোখের ভেতর তাকিয়ে বলল, 'অমিত, আমরা একটু ব্যস্ত আছি ভাই। প্লীজ তুমি যদি—'

কথাটা শেষ করেনি জ্যোতির্ময়, তবে যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে অমিত। ভদ্রতা বজায় রেখে তাকে পরিষ্কার চলে যেতে বলছে

জ্যোতির্ময়। অমিতের নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। আগে সে এলে তাকে যতক্ষণ পারত আটকে রাখত জ্যোতির্ময়, কিছুতেই যেতে দিতে চাইত না। আর আজ? বদলে গেছে জ্যোতির্ময়, একেবারেই বদলে গেছে। অমিত বলল, 'আচ্ছা ভাই, চলি—'

জ্যোতির্ময় উদাসীনভাবে বলল, সময় পেলে আরেকদিন এসো—'

অমিত উত্তর দিল না। জ্যোতির্ময়ের পাশ দিয়ে বাইরের দরজার দিকে চলে গেল। উষা সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। আগাগোড়া সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে। দুঃখিত স্বরে বলল, 'হঠাৎ ও আপনার সম্বন্ধে এরকম কোল্ড হল কেন? কিছু মনে করবেন না অমিতদা—'

অমিত আস্তে করে বলল, 'না, মনে করবার আর কী আছে।'

'আবার আসবেন কিন্তু—'

'দেখি—'

'দেখি না, আসতেই হবে। আমাদের সেই গানের প্রোগ্রামটার কথা মনে থাকে যেন—'

অমিত কিছু বলল না। বাইরের বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেট খুলে রাস্তায় চলে গেল। তারপর শীতের গাঢ় কুয়াশা আর হিম গায়ে মেখে গড়িয়াহাটায় চলে এল, সেখান থেকে বাসে শিয়ালদা।

টিকিট কেটে অমিত যখন প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছে, দেখা গেল নীলা ও-ধারের একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে। এইমাত্র একটা ট্রেন এসেছে, নীলা সেই ট্রেনেই ছিল।

রাতের এই ডাউন ট্রেনটায় খুব ভিড় ছিল না। দু-তিন শোর মতো প্যাসেঞ্জার হবে। তাদের সঙ্গে গেটের বাইরে এসে সার্কুলার রোডের দিকে যাচ্ছিল নীলা, অমিত তাকে দেখতে গেল। একই সঙ্গে নীলার চোখও অমিতের ওপর এসে পড়েছে। নীলা হাত

তুলে তাকে দাঁড়াতে বলে কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'কি ব্যাপার, এত রাতে কলকাতায় ?'

অমিত বলল, 'সেই পুরনো ব্যাপার—চাকরির খোঁজ। অফিস-পাড়া থেকে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

'ও—' বলেই একটু চুপ করল নীলা। তারপর কি ভেবে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল।'

অমিতকে উদ্বিগ্ন দেখাল; কিছু না বলে সে নীলাকে দেখতে লাগল।

আরেকটু কাছে এসে নিচু গলায় নীলা বলল, 'আপনার ভাই বাসুকে সাবধান করে দেবেন—'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'ও কী করে আপনি নিশ্চয়ই জানেন—'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু জানি।' জোরে শ্বাস টানল অমিত।

নীলা বলল, 'খুব বেশি ছেনতাই হচ্ছে বলে আমাদের লাইনের ট্রেনগুলোতে আজ থেকে পুলিশ দিচ্ছে। রাত আটটার পর যত ট্রেন যাওয়া-আসা করবে সবগুলোতেই পুলিশ থাকবে।'

দুর্বল নার্ভে হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল অমিতের। বাতাসে এখনও অক্সিজেনের অভাব হয়নি, তবু শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল তার।

নীলা বলল, 'আচ্ছা চলি। আপনার চাকরি খোঁজা শেষ হল, আমার চাকরি এখন থেকে শুরু। ইটারন্যাল নাইট ডিউটি।' করুণ একটু হাসল সে, তারপর হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ট্রাম রাস্তার দিকে চলে গেল।

অমিত কিন্তু তক্ষুনি প্ল্যাটফর্মে গেল না। রাতের ট্রেনে পুলিশ দিচ্ছে। বাসুর কিছু হবে না তো? মাথার পেছন থেকে সেই ব্যথাটা পিঠময় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

॥ আট ॥

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিবে সোজা ছাদের ঘরে চলে এল অমিত। এখন সাড়ে দশটার মতো বাজে। এর মধ্যেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাবা-মা বা মিতু—কেউ আর জেগেটেগে নেই, গাঢ় ঘুমে সবাই ডুবে আছে। বাস্তু আর সান্নু এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না, যদি ফিরেও থাকে, ঘুমিয়ে পড়েছে।

বোতাম টিপে আলো জ্বালতেই অমিত দেখতে পেল, টেবলের ওপর তার খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে, পাশে একটা চিঠি। তার ফিরতে দেরি হলে মা কিংবা মিতু খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যায়।

অমিত দ্রুত একবার ভাবল, চিঠিটা কে দিতে পারে? অন্য-মনস্কের মতো জামা-টামা বদলে বাইরে থেকে হাতমুখ ধুয়ে এল সে। তারপর টেবলের কাছে গিয়ে নীল রঙের এনভেলপটা তুলে নিল। খামটা ছিঁড়ে ভেতরকার চিঠি বার করে প্রথমে লেখার নিচের নামটা দেখে নিল—মনোবীণা মল্লিক। তারপর চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

মনোবীণা মল্লিক মল্লিকসাহেবের স্ত্রী। তিনি লিখেছেন বেশ কিছুদিন অমিত তাঁদের বাড়ি যাচ্ছে না; এতে রুমী আর সোমার পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হচ্ছে। অমিত কি অসুস্থ? যদি সে ভালো থাকে অবশ্যই যেন চিঠি পেয়ে তাঁদের বাড়ি যায় আর অসুখ-বিসুখ করে থাকলে তাঁকে যেন চিঠি লিখে জানায়। অমিতের জন্য তিনি খুব চিন্তায় আছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা ভাঁজ করে এনভেলপের ভেতর পুরে টেবলে রেখে দিল অমিত। সেই প্রতিজ্ঞাটার কথা আরেক বার মনে পড়ে গেল তার—না, কিছুতেই মল্লিকসাহেবের মেয়েদের পড়াতে

যাবে না। লোকটা প্রতারক, একসপ্লয়টার। নাকের ডগায় চাকরির টোপ ঝুলিয়ে বিনে পয়সায় তাকে মাসের পর মাস খাটিয়ে নিচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলল, ওদের সম্বন্ধে আর ভাববে না। টেবলের সামনের চেয়ারটার বসে ঢাকনি সরিয়ে রুটি-তরকারি-ডাল-টাল বার করে খেতে লাগল। পাঁচ মিনিটে খাওয়া চুকিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে শরীর দারুণ ক্লান্ত হয়ে আছে শুতে না শুতেই অমিত ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠে বছরের আরো তিনশো চৌষট্টি দিনের মতোই দাঁত মাজল অমিত মুখ ধুল, চা খেল। কিন্তু শীতের বেলা যত বাড়তে লাগল, আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে বেয়ে সূর্যটা যত ওপরে উঠতে লাগল ততই সেই সংকল্পের ভিতটা যেন দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। সে ভাবল, বাড়িতে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়? তার চারধারে চাপ চাপ ভারী অনড় অন্তহীন সময়। এই অফুরন্ত সময়কে ক্ষয় করার জন্যও তার কিছু একটা করা দরকার। সময়ের সঙ্গে পেসেন্স খেলে খেলে সে আর পারছে না। পয়সা না পাওয়া যাক, তবু সে মল্লিকসাহেবের বাড়ি যাবে। রুমী আর সোমাকে পড়িয়ে খানিকটা সময় অন্তত কাটবে। তাছাড়া একা একা চুপচাপ বসে থাকলে বেকারত্ব যেন চাক চাক পাথরের মতো তার বুকের ওপর চেপে বসে, অমিতের শ্বাস তখন আটকে আসে।

কাল মা যা দিয়েছিল তার থেকে একটা টাকা বেঁচেছে। মায়েব কাছ থেকে আজ আরো একটা টাকা নিয়ে দুপুবে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ল অমিত।

স্টেশনে এসে আজও নীলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা ডাউন ট্রেন থেকে নেমে সে গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসছিল।

কাল রাত্রেই শিয়ালদা নর্থে নীলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তার চুল, শাড়ির ভাঁজ, ঠোঁট এবং গালের রং—সব ছিল নিখুঁত,

ঝকঝকে আজ তার চুল এলোমেলো, শাড়িটাড়ি চটকানো, মুখে এনামেল অনেক জায়গায় উঠে গেছে, চোখের তলায় এক ইঞ্চি কালি। এক রাতের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। কলকাতা থেকে ফেরার সময় তাকে এরকম ভাঙ্গাচোরা বিধ্বস্ত চেহারাতে আরো অনেকবার দেখেছে অমিত। কিন্তু সে অবাক হচ্ছিল অন্য কথা ভেবে। এমনিতে নীলা বেশির ভাগ দিনই বিকেল কি সন্ধ্যেয় বেরিয়ে লাস্ট ট্রেনে রানীবাজার ফিরে আসে। মাঝে মাঝে কলকাতায় রাত কাটলে পরের দিন সকালে সে,ফিরবেই। কিন্তু এত বেলায় কখনও নীলা ফেরে না।

কাছাকাছি এসে অস্পষ্ট হাসল নীলা। বলল, 'বেরুচ্ছেন?'

অমিত আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।

'চাকরির ব্যাপারে?'

'না, সময় কাটাতে।'

একটু চুপ। কিছুক্ষণ আগে অমিত যা ভাবছিল তাই জিজ্ঞেস করল 'আজ ফিরতে এত দেবি হল?'

নীলার চোখ কুঁচকে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ঠোঁট কামড়ে সে বলল, 'ওভারটাইম ছিল। আচ্ছা যাই—' পাশ কাটিয়ে নীলা চলে গেল।

অমিতও দাঁড়াল না, কাউণ্টার থেকে টিকেট কিনে প্ল্যাটফর্মে আসতে আসতেই কলকাতার ট্রেন এসে গেল।

ট্রেনে উঠে, কি আশ্চর্য, নীলার কথা মনে থাকল না অমিতের। এমন কি যাদেব কাছে যাবার জন্য সে বেরিয়েছে সেই মনোবীণা মল্লিক এবং তাঁর দুই মেয়ে রুমী আর সোমাও তার ভাবনার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে গেল। আচমকা সতীর কথা মনে পড়ে গেল।

সতী আর উষা, সতীর বাবা-মা বার বার তাকে ওঁদের বাড়ি যেতে বলেছেন। এই বলাটা কতখানি আন্তরিক অমিতের বুঝতে

সুবিধা হয় নি। কিন্তু জ্যোতির্ময়, একেবারেই বদলে গেছে। তাব কথাবার্তায় আচরণে বিন্দুমাত্র উষ্ণতা নেই। আরো একটা কথা অমিতের মনে পড়ে গেল। সেই মধ্যবয়সী লোকটা যার চুল ডাই-করা, যাকে 'স্যার স্যার করে যাচ্ছিল জ্যোতির্ময় আর চেনেবাঁধা বিশ্বাসী প্রভুভক্ত কুকুরের মতো প্রায় তার পা চাটছিল সে কে? তাকে দেখে সতীর মুখ অত শক্ত হয়ে যাচ্ছিল কেন?

জ্যোতির্ময়েব ব্যবহার যখন ওইবকম অপমানজনক তখন ওদের বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে? পরক্ষণেই সে ভাবল, যেমনই হোক, মতটাই বদলাক, বাড়ির আর সবাই তো যথেষ্টই আন্তরিক। অমিত ভাবল, যদিও ওবা ছুটির দিনে যেতে বলেছে, রুমী সোমাকে পড়িয়ে আজই একবাব সতীদের বাড়ি যাবে।

॥ নয় ॥

মল্লিকসাহেবের শ্যামবাজারে বাড়িটা পুরনো ধাঁচের। বড় বড় থাম, শ্বেতপাথর বসানো চওড়া চওড়া সিঁড়ি খড়খড়িদেওয়া মস্ত মস্ত জানালা বাড়িটা দোতলা, কিন্তু তার যা উচ্চতা তাতে এ কালের চার-তলা একটা বাড়ি অনায়াসেই করা যায়। মেঝে থেকে সিলিং প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে, সেখান থেকে দু-ব্লেডওলা উনিশ শো চব্বিশের মডেলের ফ্যান ঘড়াং ঘড়াং করে ঘুরতে থাকে। এ বাড়ির আসবাব-পত্র সব বার্মা টিকের—দারুণ ভারী ভারী এবং কারুকাজ-করা। গোটা বাড়িটার গায়ে প্রাচীন কালের গন্ধ মাখানো।

অমিত শুনেছে মল্লিকসাহেবের ঠাকুরদা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষাশেষি এ বাড়িটা করিয়েছিলেন। সেদিক থেকে এ বাড়ির বয়স প্রায় আশী নব্বই বছর। ঠাকুরদাকে ধরে তিন জেনারেসনে প্রচুর লোকজন বেড়েছে। একসঙ্গে কেউ নেই, পার্টিসান ওয়াল তুলে সবাই ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বাড়িটায় সবসময় যেন বাজার বসে আছে। চিৎকার, হল্লা, ভনভনে আওয়াজে মাথার শির ছিঁড়ে যেতে থাকে। মল্লিকসাহেব যে সাদার্ণ এ্যাভিনিউয়ে ফ্লাট কিনেছেন এটা তার বড় একটা কারণ।

মল্লিকসাহেবদের ভাগে দোতলার পূব দিকে শেষ তিনখানা ঘর পড়েছে, অবশ্য সেই সঙ্গে ডাইনিং স্পেস এবং এক টুকরো রান্নাঘরও আছে।

অমিত বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। তারপর একটানা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে মল্লিকসাহেবদের ঘরের কাছে এসে ডাকল, রুমী—রুমী—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের ঘরটা থেকে রুমী আর সোমা দুই

বোন বেরিয়ে এল। রুমীর বয়স ষোল-সতের, সোমার পনের। ওরা যে বোন বলে দিতে হয় না। চোখ-মুখ-নাক-চিবুক-কপালের গড়ন, এমন কি গায়ের রংও দুজনের প্রায় একই রকম। রুমী বলল, এতদিন আসেননি কেন অমিত্‌কাকু ?'

উত্তর না দিয়ে অমিত হাসল। তারপর রুমীদের সঙ্গে ভেতরে চলে এল। এই ঘরটা ওদের পড়ার ঘর। একধারে চেয়ার, টেবল আরেক ধারে ডিভান, বুক কেস ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত সোজা পড়ার টেবলের পাশের একটা চেয়ারে বসল। সোমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা—মা—'

ভেতর থেকে মনোবীণা মল্লিকের গলা শোনা গেল, 'কি রে—'

'অমিতকাক এসেছেন—' সোমারা অমিতকে মাস্টারমশাই বা স্যার বলে না, কাকু বলে। মনোবীণাই বলতে বলেছেন।

মনোবীণা বললেন, 'বসতে বল, আমি আসছি।' বলতে বলতেই তিনি এ ঘরে এলেন।

মনোবীণার বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। কাগজের মতো সাদা ফ্যাটফেটে গায়ের রং। চামড়ার তলা থেকে হাড় আর রক্তবাহী শিরগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখ তোবড়ানো গাল ভেতরে ঢুকে গেছে। তবু তারই মধ্যে টের পাওয়া যায় গায়ে মাংস লাগলে এই মহিলা দারুণ সুন্দরী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এ জন্মে মাংস আর লাগাবে কি ?

পায়ের তলা থেকে চুল পর্যন্ত ভদ্রমহিলা পুরোপুরি এ্যানিমিক, মল্লিকসাহেব যখন শরীরে দুর্দান্ত রক্তচাপ বয়ে বেড়াচ্ছে সেইসময় তাঁর স্ত্রী রক্তহীনতায় ভুগে যাচ্ছেন।

মনোবীণা সেই প্রশ্নটাই করলেন অর্থাৎ কেন এতদিন অমিত তাঁদের বাড়ি আসে নি ?

এখানে না আসা সম্পর্কে অমিত যা ভেবে রেখেছে তা আর

বলা গেল না অপরিষ্কার গলায় সে শুধু বলল, 'এই মানে নানারকম ঝঞ্ঝাটে—'

'তোমার আবার ঝঞ্ঝাট কি ?'

অমিত হাসল। আর তখনই তার চোখে পড়ল মনোবীণার কাপড়ে এবং হাতে হলুদ-টলুদের দাগ। মনে হল, এইমাত্র তিনি রান্নাঘর থেকেই এলেন। একটু অবাক হয়ে অমিত বলল, রান্নাটান্না করছিলেন নাকি ?,

'হ্যাঁ।' মনোবীণা ঘাড় কাত করলেন।

অমিত জানে রান্নাবান্নার জন্য এঁদের লোক আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের রান্নাব লোকটা নেই ?'

'আছে।'

'তা হলে—'

অমিতের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন মনোবীণা। বললেন 'ইচ্ছা হল ক'টা স্পেশাল রান্না করি। ঠাকুরকে দিয়ে ওসব হবে না। তাই নিজেই কিচেনে ঢুকে গেলাম।'

অমিত চুপ করে থাকল।

মনোবীণা আবার বললেন, 'আজ এসে তুমি ভালই করেছ। খুব তাড়া নেই তো ?'

অমিত ভেবে রেখেছিল রুমীদের পড়িয়ে সন্ধ্যের সময় সতীদের বাড়ি যাবে। এখন ক'টা আর বাজে, খুব বেশি হলে আড়াইটে-তিনটে। হাতে অঢেল সময় রয়েছে। সে বলল, 'না, তেমন কিছু নেই।'

'তা হলে তুমি ওদের পড়াটা দেখিয়ে দাও, আমি রান্না সেরে ফেলি।'

'আচ্ছা—'

মনোবীণা চলে গেলেন। অমিত ভাবল, হঠাৎ তাঁর এত রান্নার

সখ কেন, রুমীদের কাছে জেনে নেয়। কি ভেবে, শেষ পর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করল না।

তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত রুমীদের পড়াল অমিত ফাঁকে ফাঁকে গল্প-টল্পও করল। মাঝখানে তু'বার চা, কাটলেট এবং আরো অনেক রকম খাবার-দাবার দিয়ে গেছেন মনোবীণা।

পাঁচটার পর অমিত উসখুস করতে লাগল। শীতের রোদ এর মধ্যেই মরে গেছে। সূর্যটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, ফিকে আভাব মতো শেষ বেলার রংটুকু আলতোভাবে আকাশের গায়ে আটকে আছে। তবে পশ্চিমদিকের আকাশে পাতলা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

এই নর্থ ক্যালকাটা থেকে সতের আঠর কিলোমিটার দূরে সতীদেব বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে যেতেই ঘণ্টা দেড়েক লেগে যাবে। সেখানে তু-আড়াই ঘণ্টাও যদি থাকে, বানীবাজারে কখন ফিরবে? অমিত কী করবে যখন ভাবছে, ভেতর থেকে হঠাৎ মনোবীণা বললেন, 'আবেকটু বোসো অমিত, আমার হয়ে এসেছে।' মনোবীণা তার চাইতে বয়সে অনেক বড়; প্রথম দিন থেকেই অমিতকে 'তুমি' করে বলে আসছেন।

অমিত সঙ্কোচের গলায় বলল, সন্ধ্যের পর আমার একটা কাজ ছিল—'

আজ কাজ-টাজ বাদ দাও। তুমি যখন এসেই গেছ, এখন আর ছাড়ছি না। আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

আট দশ মাস এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে অমিত। মনোবীণা কখনও তাঁর সঙ্গে কোথাও যেতে বলেন নি। সে অবাক হচ্ছিল। বলল, 'কোথায় যেতে হবে।'

মনোবীণা অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধর না বাপু; অত তাড়া কিসের? গেলেই তো দেখতে পাবে।'

অমিত আর কী বলবে? সে কমজোরী দুর্বল মানুষ; কোন বিষয়েই জোর খাটাতে পারে না। পড়াশোনা হয়ে যাবার পর রুমী আর সোমা চলে গিয়েছিল; একা-একা অমিত এ ঘরে বাস থাকল। সকালবেলার পুরনো বাসি একটা খবরের কাগজ টেবিলের ওপর পড়ে ছিল; নিরাসক্তভাবে সেটাই দেখতে লাগল।

আধ ঘণ্টা বাদে মনোবীণা এ ঘরে এলেন। এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অমিত। তার শিথিল শক্তিহীন স্নায়ুগুলোর ওপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ঝড়ের মতো কিছু বয়ে গেল। মেরুন রঙের অত্যন্ত দামী একটা বেনারসী পরেছেন মনোবীণা; জামাটা ওই কাপড়েরই। চুল উঁচু করে বিশাল একটা খোঁপায় আটকানো; তার ওপর সোনার চিরুনি গোঁজা। গলায়-কানে-হাতে, সারা গায়েই তাঁর জড়োয়া গয়না। শরীরময় হীরে আর মুক্তো চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে অমিতের।

একা মনোবীণাই আসেন নি; তাঁর সঙ্গে রুমী সোমাও এসেছে। আর এসেছে তাঁদের দুই চাকর আর একটা ঝি। ঝি-চাকরদের হাতে স্টেনলেস স্টীলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে টিফিন ক্যারিয়ার আর ঝিয়ের হাতে গোছা গোছা রজনীগন্ধার স্টিক, গোলাপের বোকে, যুঁই-এর মালা। আর আছে বিরাট বিরাট তিনটে ফুলের প্যাকেট।

মনোবীণা মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা লক্ষ্মী হয়ে থেকো, আমি আজ রাত্তিরে ফিরছি না।'

'আচ্ছা—' রুমীরা মাথা নাড়ল।

এবার মনোবীণা অমিতকে বললেন, চলো—'

অমিতের হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন থেমে গেল যেন। এই মহিলাটি মূল্যবান হীরাপান্নায় সেজে রাশি রাশি ফুল আর অজস্র খাবার নিয়ে তাকে সঙ্গে করে কোথায় চলেছেন? মহিলা মেয়েদের বলছিলেন আজ আর ফিরবেন না। উদ্দেশ্য কী তাঁর? শ্বাসকষ্টের মতো শব্দ করে অমিত বলল, 'আজ্ঞে—'

তার মনোভাবটা নিমেষে বুঝে নিয়ে মনোবীণা বললেন, 'ভয় নেই ; এসো—'

সম্মোহিতের মতো মনোবীণার ছায়া হয়ে হাঁটতে লাগল অমিত। তারপর দোতলা থেকে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে চওড়া চওড়া শ্বেত-পাথরেব সিঁড়ি ভেঙে এ বাড়ির অগুনতি মানুষের ভেতর দিয়ে কখন তাবা নিচে নেমে এসেছে, খেয়াল নেই।

অমিত দেখল বাড়ীব সামনে মাঠের মতো ফাঁকা জায়গাটায় একটা ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে। মনোবীণা তাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন ; ঝি-চাকববা টিফিন ক্যাবিয়াব আর ফুলেব প্যাকেটগুলো গাড়িতে তুলে দিল। মনোবীণা ট্যাক্সিওবালাকে বললেন, 'চৌবঙ্গীব দিকে চলো—,

বাড়ীর কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে গাড়িটা বিধান সরণিতে এসে পড়ল। মনোবীণা পাশ থেকে বললো, 'তুমি খুব অবাক হচ্ছ না ?'

অপবিষ্কার গলায় কিছু বলতে চাইল অমিত ; পারল না।

মনোবীণা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমার স্বামী, মানে তোমাদেব মল্লিকসাহেবের নতুন ফ্ল্যাটে চাকরিব জন্য তুমি তো অনেকবার গেছ ?'

অমিত সতর্ক চোখে মনোবীণাকে দেখতে দেখতে বলল, 'তিন চারবার গেছি।'

'তাতেই হবে। ওই ফ্ল্যাটটা কোথায় আমি ঠিক জানি না ; তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম। ড্রাইভারকে ওখানে যেতে বলে দাও।'

স্বামীব নতুন ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দেবাব জন্যই তাহলে মনোবীণা মল্লিক তাকে নিয়ে বেরিয়েছেন ? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অমিতেব নেহাতই ভূমিকা গাইডেব। এতক্ষণে সেই শ্বাসকষ্টের মতো ভাবটা কেটে যেতে লাগল অমিতের। বুক বোঝাই ক'রে শীতের বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিতে নিতে সে ড্রাইভারকে বলল, 'সাদার্ণ এ্যাভিনিউ চল ; স্টেডিয়ামের কাছে—'

মনোবীণা জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। অন্যমনস্কর মতো বাইরের উঁচু উঁচু বাড়ি, ঝলমল দোকানের শো উইণ্ডো, দ্রুতগামী গাড়ির স্রোত দেখতে দেখতে বললেন, 'আজকের রাতটা আমি আমার স্বামীর ফ্ল্যাটেই থাকব অমিত।' একটু থেমে কি ভেবে আবার বললেন, 'ওখানে গিয়ে তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না ; দশ মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেব।'

অমিত উত্তর দিল না। সন্ধ্যে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। ঠাণ্ডা বাতাস চারদিকে এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ একটা কথা ভেবে দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ল অমিত। শীতের রাতেও সে টের পেল ঘাড়ের কাছে এবং বুকে ঘামের দানা জমছে। মল্লিকসাহেব তো তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে একা-একা রাত কাটান না ; রোজই দু-একটা মেয়ে থাকে। মনোবীণা মল্লিক ওখানে গেলে কি যে হবে, ভাবা যাচ্ছে না। আজ একটা বিস্ফোরণ অনিবার্য। ঘাড়ের কাছে সেই পুরনো ব্যথাটা অনুভব করতে লাগল অমিত।

জানালার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোবীণা ডাকলেন, আচ্ছা অমিত—'

অমিত সোজাসুজি মনোবীণার দিকে তাকাল। মনোবীণা বললেন, 'তুমি তো ওই ফ্ল্যাটে গেছ ; মল্লিকসাহেবের সঙ্গে কোন মেয়ে-টেয়ে দেখেছ?'

ঢোক গিলে জড়ানো গলায় অমিত বলল, 'না মানে, আমি তো দশ-পনের মিনিটের বেশি কোনবারই থাকি নি। আমার চোখে কিছু পড়ে নি।' চোখ-কান বুজে সে মিথ্যেই বলল।

কয়েক পলক তীক্ষ্ণ চোখে অমিতকে লক্ষ্য করলেন মনোবীণা ; তারপর ড্রাইভারের সামনে উইণ্ডস্ক্রিণ্টার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি বলছ?'

হেঁচকি তোলার মতো গলার ভেতর শব্দ করল অমিত, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আমি কিন্তু খবর পেয়েছি তোমাদের মল্লিকসাহেব মেয়েমানুষ নিয়ে ওখানে বেশ মজায় আছে। আমি কিন্তু ওকে সহজে ছাড়ছি না।'

অমিত চুপ।

মনোবীণা বলে যেতে লাগলেন, আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। মেয়ে-টেয়ে নিয়ে সে এমনই মত্ত, ম্যারেজ এ্যানিভার্সারির দিনটা পর্যন্ত বাড়ি থাকে না। এটা ঠিক আমার শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে আকর্ষণ করার মতো কিছুই নেই আমার। তবু স্ত্রী তো ; তোমাদের মল্লিকসাহেব অত সহজে মুক্তি পাচ্ছে না।'

অমিত ভাবছিল বিবাহবার্ষিকীর জন্যই তা হলে এতো সেজেছেন মহিলা ; স্বামীকে খাওয়াবার জন্য নিজের হাতে এত রকম রেঁধে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু মল্লিক-সাহেবের ফ্ল্যাটে যাবার পর কী কী ঘটতে পারে, স্পষ্ট করে ভাবতে পারল না সে।

একসময় সাদার্ণ এ্যাভিনিউতে মল্লিকসাহেবের এ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে পৌঁছে গেল ট্যাক্সিটা। ভাড়া চুকিয়ে মনোবীণা অমিতকে বললেন, ফ্ল্যাট কোন তলায় ?'

অমিত বলল, 'টপ ফ্লোরে—বারো তলায়।'

'তুমি ভাই একটু কষ্ট করে টিফিন ক্যারিয়ারগুলো নামিয়ে আনো ; আমি ফুলের তোড়া-টোড়াগুলো নিচ্ছি।'

খাবার এবং ফুল নিয়ে অমিতরা লিফট বক্‌সে গিয়ে ঢুকল। তারপর বোতাম টিপতেই কয়েক সেকেণ্ডে টপ ফ্লোরে উঠে এল।

বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় পেতলের নেমপ্লেটে মল্লিকসাহেবের নাম লেখা ছিল। মনোবীণা মল্লিককে কিছু বলতে হল না ; সোজা গিয়ে তিনি কলিং বেলে আঙুলের চাপ দিলেন। অমিত অনুভব করতে লাগল তার বুকের ভেতর তাসার বাজনার মতো অনবরত একটা ঝোড়ো শব্দ হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গিয়েছিল ; স্টিফেনকে দেখা গেল। মনোবীণা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাহেব কোথায় ?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে হকচকিয়ে গেল স্টিফেন। আঙুল বাড়িয়ে ভেতর দিকটা দেখিয়ে দিল সে। মনোবীণা ঘাড় ফিরিয়ে অমিতকে বললেন, 'এসো—' বলেই শরীরটাকে ঋজু রেখার মতো টান টান করে ভেতরে এগিয়ে গেলেন।

স্টিফেনকে পাশ কাটিয়ে অমিত যখন যাচ্ছিল, সে চাপা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লেডি কে ?'

অমিত বুঝল স্টীফেন মনোবীণাকে চেনে না। বলল, 'সায়েবের স্ত্রী—'

দু হাত উল্টে দিল স্টিফেন ; ঘাড়টা ভেঙে একধারে লটকে পড়লে যেন। তার গলার ভেতর থেকে হিক্কার মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'মাই গস—

'কী হল ?'

'ফিনিশড—খতম।'

'তার মানে ?'

'জিনা লোলাব্রিজিডা আর ব্রিজিট বার্ডোত—আজ দুটো মেয়ে নিয়ে এসেছে সাহেব ; ড্রিংক করছে। এখন কী হবে ?'

মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা বরফ নেমে গেল অমিতের। সে আর দাঁড়াল না ; মনোবীণা যেদিকে গেছেন সেদিকে চলে গেল।

ডানদিকের প্রথম ঘরটার কাছে আসতেই দেখতে পেল একটা সোফায় মল্লিকসাহেব বসে আছেন ; তাঁর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় দুটি মেয়ে—দুজনেই অবাঙ্গালী। একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আরেকটি পাঞ্জাবী-টাঞ্জাবী হবে। সেণ্টার টেবলে হুইস্কির বোতল, গেলাস, বড় বড় প্লেটে কাজু বাদাম, ফিশ ফিঙ্গার, চিকেন রোল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মনোবীণা মল্লিক। তাঁর চোখ দপ দপ করছিল।

মনোবীণার গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছে অমিত। তার চোখ আপাতত মল্লিকসাহেবের ওপর। ভদ্রলোকের পাকস্থলীতে এর মধ্যে ক' পেগ হুইস্কি ঢুকে গেছে, সে জানে না। অমিত লক্ষ্য করলে মল্লিক-সাহেব দারুণ ঘামছেন ; মুখটা সাদাটে। দেখে এখন মনেই হচ্ছে না, তাঁর শরীরে উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। বরং মনে হয় অনেক দিন তিনি রক্তাল্পতায় ভুগছেন। রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলাটলা মুছে মল্লিক-সাহেব বললেন, 'এ কি তুমি এখানে ?'

দপদপে চোখে তাকিয়েই মনোবীণা বললেন তুমিই আমাকে আসতে বাধ্য করেছ। আজকের তারিখটা মনে আছে ?'

'না মানে—' মল্লিকসাহেব বারকয়েক ঢোক গিললেন।

'তুমি একেবারেই জাহান্নামে গেছ। আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী, কুড়ি বছর আগে আমাকে বিয়ে করেছিলে—মনে পড়ছে ?' স্বামীর স্মৃতিশক্তিকে উস্কে দিলেন মনোবীণা।

অপরাধীর মতো মুখ করে করুণ স্বীকারোক্তি করলেন মল্লিক-সাহেব, আই এ্যাম সরি, একেবারেই মনে ছিল না।'

'সেই জন্যেই মনে করিয়ে দিতে এলাম তোমার বেড রুম কোথায় ?'

'ওই যে—

'বাঁ দিকের বড় ঘরটা দেখিয়ে দিলেন মল্লিকসাহেব। সোজা সেখানে চলে গেলেন মনোবীণা ঃ তারপর ফুল-টুল দিয়ে বিছানা সাজাতে লাগলেন। আর অদৃশ্য একটা বড়শিতে আটকে মল্লিক-সাহেব ও-ঘরে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ ঘরে সেই যুবতী মেয়ে দুটি মমির মতো বসে থাকল ; তাদের শরীরে রক্ত চলাচল খুব সম্ভব বন্ধ হয়ে গেছে।

বিছানা সাজানো হলে মনোবীণা আবার এধারের ঘরে এলেন। সেই মেয়ে দুটির দিকে ফিরে বললেন, তিন শো চৌষট্টি দিন তোদের কিন্তু একটা দিন আমার। বেরোও কুত্তীর দল, গেট আউট—'

মেয়ে দুটো উঠে শুট সাট ফ্ল্যাটের বাইরে পালিয়ে গেল।

এবার নরম গলায় মনোবীণা অমিতকে বললেন, 'এখন তোমার ছুটি ; টিফিন ক্যারিয়ারগুলো দাও। আজকের রাতটা স্বামীর সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী পালন করি।' মল্লিকসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, 'এসো—' টিফিন ক্যারিয়ারগুলো হাতে ঝুলিয়ে বেডরুমে চলে গেলেন মনোবীণা। আর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল স্বামীর মতো মল্লিকসাহেব তাঁর গায়েব সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে গেলেন। একটু পবে বেড রুমে ছিটকিনি আটকাবার শব্দ হল।

আবো কিছুক্ষণ বাদে লিফটে কবে নিচে নেমে এল অমিত। সমস্ত ঘটনাটা যতবার সে ভাবছিল ততবারই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মনোবীণা মল্লিকেব এসব কবাব কাবণটা কী ? কুয়াশায় আকাশের তলায় চিন্তিত অন্যমনস্ক মানুষের মতো হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ অমিতের মনে হয়, স্বামীর ওপর নিজের দখল বজায় রাখার জন্য আশ্চর্য এক যুদ্ধে নেমেছেন মনোবীণা। হ্যাঁ, যুদ্ধই। এছাড়া তার আর কী করবার আছে ?

॥ দশ ॥

মল্লিকসাহেবের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সেদিন সতীদের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি সারা গায়ে কুয়াশা আর হিম মেখে শীতের নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনোবীণায় কথা অমিত যত ভাবছিল ততই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ! সতীব কথা তখন আর মনে পড়ছিল না। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো কখন বাসে উঠে সে শিয়ালদা এসেছে, শিয়ালদা থেকে কখন রাণীবাজারে, খেয়াল ছিল না। বাড়ি ফিরে সে ভেবে রেখেছিল পরের দিন সতীদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে যাবে, তাও যাওয়া হয় নি। সেই রাত্তিরেই ছুম করে তার জ্বর এসে গিয়েছিল।

দিন চারেক একটানা ভুগবার পর কাল জ্বরটা ছেড়ে গেছে অমিতের, আজ ভাত খেয়েছে সে। শরীরটা যদিও দুর্বল বাড়ি বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। দুপুরে সানু এবং বাসুর জামাটামা ধার করে পরে নিল অমিত চারদিন ঘরের মধ্যে আটকে আছে বুকের ভেতর একটা বিষণ্ণ গুমোট ভাব চাক চাক বরফের মতো ক্রমাগত ভার চাপিয়ে যাচ্ছিল যেন। সহজভাবে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। অবাধ আকাশের তলায় খোলা হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদে খানিকক্ষণ ঘুরে এলে বিষাদের ভাবটা কেটে যেতে পারে। অমিত তাই ছাদ থেকে নিচে নেমে এল, বারান্দায় আসতেই দেখতে পেল মা আর মিতু চুল খুলে দিয়ে শীতের রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে।

মা তাকে দেখতে পেয়েছিল। বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে ?'

অমিত বলল, 'একটু ঘুরেটুরে আসি।

আজই সবে ভাত খেয়েছিস ; এই রোগা শরীরে না বেরুলেই তো পারতিস।'

'বাড়িতে বিচ্ছিরি লাগছে।'

'তাহলে বেশি দূরেটুরে যাস না।'

'আচ্ছা।'

'ঠাণ্ডাটাণ্ডা আবার লাগিয়ে বসিস না। আবার জ্বর এলে কিন্তু মুশকিল হবে।'

ছেলেবেলায় অমিত প্রচণ্ড ভুগেছে সেই কারণে নিশ্চয়ই তা ছাড়া নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ও সব চাইতে দুর্বল আর কমজোরী বলেই হয়তো তার ওপর মায়ের স্নেহ এবং সহানুভূতি খুব বেশি অমিত জানে মা তার সম্বন্ধে সবসময় ভাবে। যাই হোক সে বলল, 'ঠাণ্ডা লাগাব না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

বাড়ির বাইরে এসে এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল অমিত। সময়টা এখন দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে আছে রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। উত্তুরে হাওয়াও খুব জোরে বইছে না। টাটকা উজ্জ্বল রোদে চারদিক ভেসে আছে। সারা গায়ে শীতের ঝিরঝিরে বাতাস রোদ আর আলস্য জড়িয়ে রানীবাজার ঝিম মেরে পড়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে সময় ঢিমেতালে তির তির করে বয়ে যাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে কখন বিকেল হয়ে গেছে। আর কখন অমিত বাজারের মতো জমজমাট সেই জায়গাটায় এসে পড়েছে মনে নেই। হঠাৎ মাইকের শব্দে সে চমকে সামনে তাকাল। 'অলঙ্কার' সিনেমার উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাটায় মিটিং চলছে—মিউনিসিপ্যাল ইলেকসানের মিটিং। যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিল।

অমিত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চট করে তার মনে পড়ে গেল, দু-তিন মাস বাদেই রানীবাজার মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসান আসছে; যজ্ঞেশ্বর তার একজন ক্যাণ্ডিডেট।

যজ্ঞেশ্বরের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। পোড়া ঝামার মতো গায়ের

রঙ। মাঝারি মাপের শক্ত চেহারা। শরীরে মোটা হাড়, চৌকা মুখ, কাঁচা-পাকা চুলে কদমছাট। ভারী ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে শাণিত দৃষ্টি টের পাওয়া যায়। পরনে খেলো হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি, বাঁ হাতে ঢাউস গোল ঘড়ি, কাঁধে থেকে মোটা স্ট্র্যাপে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

যজ্ঞেশ্বর রাজনীতি-করা মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই অমিত দেখে আসছে, যত নির্বাচন হয় সবটাতেই প্রার্থী হিসেবে সে দাঁড়িয়ে যায়। তা দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনই হোক অথবা রানীবাজার পৌরসভা, রানীবাজার কলেজ কিংবা স্কুল কমিটির নির্বাচনই হোক। সাধারণ নির্বাচনগুলোতে তিন-চার বার সে বিধানসভার জন্য দাঁড়িয়েছে, একবার কি দু-বার দিল্লীতে লোকসভার জন্য। কিন্তু এম-এল-এ বা এম-পি হওয়া তার কপালে নেই ; জেনারেল ইলেকসানে প্রতিবারই সে হেরে গেছে। কয়েক বার জামানতও তার বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। তবে রানীবাজারের স্কুল, কলেজ বা পৌরসভার নির্বাচনে অনেক বারই সে জিতেছে। কিন্তু সে যেখানেই নির্বাচিত হয়ে যায়—স্কুলে, কলেজে কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিতে—সর্বত্রই তার দুর্নাম। তার নামে ফাণ্ড ভাঙার অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যয়ের অভিযোগ, স্বজনপোষণের অভিযোগ। অভিযোগের শেষ নেই। সত্যিমিথ্যা অমিত জানে না, এ-সব নিয়ে ভাবেও না।

দু'বছর আগে পৌরসভার যে শেষ নির্বাচনটা হয়ে গেছে তাতে হেরে গেয়েছিল যজ্ঞেশ্বর। হেরেছে কিন্তু ভেঙে পড়ে নি : কোন পরাজয়ই তাকে কোনদিন ভাঙতে পারেনি। একবার হারলে বিশ-পঁচিশ গুণ উদ্যম আর শক্তি নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল মাইক ফাটিয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছিল। তার বক্তব্যের সবটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে, বাতাসে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে সে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে লোকটাকে ক্রুদ্ধ, হিংস্র,

উন্মত্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা অঘোষিত যুদ্ধে নেমেছে এবং যে ভাবেই হোক সে যুদ্ধে না জেতা পর্যন্ত সে থামছে না।

অমিতের মনে হল, তার চারপাশে সবাই যেন একটা যুদ্ধে নেমেছে, শুধু সে ছাড়া। তার ঠাণ্ডা রক্ত যজ্ঞেশ্বরের উত্তেজক বক্তৃতা শুনেও টগবগ কবে ফুটল না, বরং দুর্বল স্নায়ুগুলো উত্তেজনার গন্ধে আরো নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঘাড়ের ব্যথাটা আবার শুরু হয়ে যাবে। অমিত সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

দূরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে অমিত ভাবল, চারদিকে এত যুদ্ধ, মানুষ যে ভাবেই হোক, নিজের নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে অস্ত্র হাতে উন্মাদের মতো রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সব দেখেও সে কেন প্রেরণা পায় না, কেন সামান্য উত্তেজনাটুকুও অনুভব করে না? তার মনে হতে থাকে, এই পৃথিবীতে বসবাসের সে যোগ্য নয়; নেহাতই এক অচেনা আগন্তুকের মতো এ জগতের বাইরের স্তরে অসংলগ্নভাবে সে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে সানু হতে পারে না, যজ্ঞেশ্বর বা মনোবীণা হতে পারে না, এমন কি বাবার মতো হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব না। সে ভীরু, অসহায়, দুর্বল। হয়তো কাপুরুষও।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় স্টেশনে চলে এল অমিত। অভ্যাস-বশত একবার দুনম্বর প্ল্যাটফর্ম আর ওভারব্রিজের দিকে তাকাল। না, আজ আর নীলাকে দেখা গেল না। তার বদলে চোখে পড়ল, দূরে লেভেল ক্রসিং-এর ওধার থেকে কলকাতাগামী ট্রেনটা হু-হু করে ছুটে আসেছ। মাকে বলে এসেছিল, একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে কিন্তু কি হয়ে গেল যে অমিতের, কাউন্টারে গিয়ে একখানা টিকেট কিনে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল ততক্ষণে কলকাতার একটা ট্রেন এসে গেছে। গাড়িটা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে কখন যে আবার ছুট

লাগিয়েছে, অমিতের খেয়াল নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে দেখল, শিয়ালদা নর্থে পৌঁছে গেছে। অসংখ্য মানুষের দেয়াল ঠেলে ট্রাম রাস্তায় আসতেই আচমকা সতীর কথা মনে পড়ে গেল তার। ভেতরে ভেতরে কোন অবচেতন স্তরে সতীর ভাবনাটা হয়তো চলছিলই ; সেটাই টানতে টানতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

এখনও পাঁচটা বাজে নি, তবু যথারীতি ট্রাম-বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তবু তারই মধ্যে পা ঢুকিয়ে ঝুলে ঝুলে সতীদের বাড়ি পৌঁছে গেল অমিত। কলিং বেল টিপতে উষা আজ দরজা খুলে দিল। সতী কি বাড়ি নেই ? বুকের মধ্যে খিঁচ ব্যথার মতো কিছু একটা অনুভব করল অমিত।

উষা উজ্জ্বল হাসিমুখে বলল, 'আসুন অমিতদা—'বলেই ঘাড় ফিরিয়ে গলা তুলে ডাকল, 'ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি, দেখে যাও, কে এসেছে—'

সতী তা হলে বাড়িতেই আছে। অমিতের নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। সোফায় গিয়ে বসতে না বসতেই দেখা গেল, ভেতর দিকের পর্দা ঠেলে সতী এ ঘরে চলে এসেছে।

উষা আর সতী মুখোমুখি বসল। উষা বলল, 'আমরা আপনার ওপর রাগ করেছি।'

অমিত হাসল, 'কেন ?'

'আপনার কবে আসার কথা ছিল ?'

'ক'দিন খুব ভুগলাম, তাই আসতে পারি নি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে সতী এবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ?'

অমিত বলল, 'তেমন কিছু না, এই একটু জ্বর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অমিত বলল, 'মাসিমা মেসোমশাই কেমন আছেন ?'

'ওই একরকম।'

'চল, দেখা করে আসি।'

সতীর মা-বাবার ঘরে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-টথা বলে আবার বাইরের ঘরে ফিরে এল।

উষা বলল, 'আজ কিন্তু আপনাকে গান শোনাতে হবে অমিতদা।

দ্রুত একবার জ্যোতির্ময়ের কথাটা ভেবে নিল অমিত। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল সে। সেদিনের অসম্মানজনক উদাসীন ব্যবহারের কথা ভোলে নি। বলল, 'ছুটির পব জ্যোতি বাড়ি এসে জলসা করছি দেখলে রেগে যাবে।'

উষা চট করে তার মনের কথাটা বুঝে নিল। সেদিন অমিতকে দেখবার পর জ্যোতির্ময়ের ঠাণ্ডা উচ্ছ্বাসহীন ভাবটা লক্ষ্য করেছিল উষা। বলল, 'আপনার বন্ধু এখন কলকাতায় নেই।'

'কোথায় গেছে ?'

'অফিসের কাজে হায়দ্রাবাদ। তিন চার দিন পর ফিরবে।'

অস্বস্তির ভাবটা এক নিমেষে কেটে গেল যেন অমিতের। ভেতরে ভেতরে নিজেকে দারুণ ঝরঝরে আর হাল্কা মনে হতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সতী একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই আবছা হাসির আভা তার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল। জ্যোতির্ময় বাড়ি ফিরবে না জেনে সে যে খুশী, সতী কি তা টের পেয়ে গেছে ?

উষা বলল, 'আগে চা খান। তারপর কিন্তু হারমোনিয়াম টারমোনিয়াম বার করছি—'

অমিত হাসল। বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েদের তো দেখছি না—'

'আর বলবেন না। বিকেল বেলা আমার ছোট ভাইটা এসে ওদের নিয়ে গেছে।'

'আমি যেদিনই আসি সেদিনই দেখছি ওরা মামাবাড়ি চলে যায়—'

উষা হেসে হেসে উঠে পড়ল। তারপর পর্দা ঠেলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

আর সেই মুহূর্তে সেদিনকার সেই লোকটা, যার কাছে জ্যোতির্ময়কে একটা চেনে-বাঁধা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো মনে হচ্ছিল —তার কথা মনে পড়ে গেল অমিতের। লোকটা কে? অমিত ভাবল সতীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। কি ভেবে শেষ পর্যন্ত আর করল না।

চা'টা খাবার পর উষা আর সতী তানপুরা, হারমোনিয়াম টারমোনিয়াম নিয়ে এল। সত্যি সত্যিই বাইরের ঘরে ওরা একটা গানের আসর বসিয়ে দিল। প্রথমে গাইল উষা; মিষ্টি ভরাট গলায়। ওর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে মনেই হয় না উষা দক্ষিণী মেয়ে। ও চারখানা গান গাইল, সবই প্রেমের গান। উষার পর সতী। রবীন্দ্রনাথের যে সব গানে ঈশ্বর বিষয়ক উপলব্ধি, যে গানগুলো সব কিছুর ঊর্ধ্বে অন্য কোন গভীর অন্বেষণে মানুষকে নিয়ে যায় তেমন পাঁচ-ছ'খানা গান বেছে নিয়ে ও গাইল।

নিয়মিত অনুশীলন-করা মার্জিত গলা সতীর। পা দুটো মুড়ে, তানপুরাটা পাশে দাঁড় করিয়ে এবং গ্রীবা বিনম্র ভঙ্গিতে হেলিয়ে ও গাইছিল। গাইতে গাইতে ওর চোখ বুজে গিয়েছিল। চওড়া জরির পাড়-বসানো ধবধবে সাদা তাঁতের একটা শাড়ি ও আজ পরেছে। জামাটা সাদা সিল্কের। তার ওপর ঘন দুধ রংয়ের কারুকাজ-করা শাল আলতো করে জড়ানো। আঙুলে সাদা পোখরাজ-বসানো আংটি। সতী যখন তানপুরার তারে ধীরে আঙুল চালাচ্ছে, আংটির পোকরাজে আলো পড়ে চারদিকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

গাইতে গাইতে সুরের সঙ্গে যেন গলে গলে একাকার হয়ে যাচ্ছিল সতী। আর তাকে দেখতে দেখতে অমিতের মনে হচ্ছিল,

এই সতীকে সে চেনে না। এই সতী যেন অপার্থিব কিছু। ছুঁতে গেলেই মিলিয়ে যাবে।

সতীর শেষ গান থামার পরও ঘরের বাতাসে সুরের রেশটা কোমল পায়ে হেঁটে বেড়াল। আর তানপুরার তারে আঙুলে রেখে চোখ বুজে অলৌকিক কোন ছবির মতো বসে থাকল সতী।

কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেলে নিষ্পাপ বালিকার মতো হাসল সে। তানপুরাটা আস্তে আস্তে ডিভানে শুইয়ে দিয়ে বলল, 'এবার আপনার পালা অমিতদা—'

নিজেকে সম্মোহিতের মতো মনে হচ্ছিল অমিতের। সতীর গানের রেশ তার স্নায়ুর মধ্যে তখনও ছড়িয়ে আছে। সে বলল, 'তোমার পর আমার গান গাওয়ার মানে হয় না। তোমার গলা এত সুন্দর হয়েছে, ভাবতেও পারি নি।'

প্রশংসায় সতী লাজুক হাসল। তারপর বলল, 'ওসব বলে এ্যাভয়েড করতে পারবেন না। গাইতে আপনাকে হবেই।'

জোর করেই সতীরা অমিতকে দিয়ে গাওয়াল। অনেক কাল অভ্যাস নেই। প্রথম প্রথম গলা উঠছিল না। দু-তিনটে গাইবার পর স্বরটা অনেকখানি ছেড়ে গেল।

অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্তের খান-পাঁচেক গান গেয়ে অমিত থামতেই উষা আর সতী এক সঙ্গে বলে উঠল, 'ফাইন। এত চমৎকার গলা আপনার, আর গাইতে চাইছিলেন না!'

অমিত হাসল, কিছু বলল না।

এদিকে কখন সন্ধ্যে পেরিয়ে ঝপ করে শীতের রাত নেমে এসেছে, কারো খেয়াল নেই। দেয়ালের মিউজিক্যাল ঘড়িটায় সাড়ে আটটা বাজতেই চমকে উঠল অমিত। বলল, 'এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে।' বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল।

সতী বলল, 'হ্যাঁ, শীতের রাতে অতদূর যাবেন। আপনাকে আর আটকাবো না।

সেদিন উষা তাকে এগিয়ে দেবার জন্যে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত এসেছিল। আজ সতী তার সঙ্গে এল।

বারান্দা থেকে সিঁড়িতে একটা পা দিয়ে অমিত বলতে যাচ্ছিল, 'চলি—' হঠাৎ সেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। দ্বিধান্বিতভাবে একটু দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

'তোমার দাদার সঙ্গে সেদিন যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি কে ?'

বারান্দায় আলো ছিল না। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘর থেকে টিউব লাইটের যে আলো বাইরে এসে পড়েছে তাতে দেখা গেল, সতীর নিষ্পাপ পবিত্র মুখে শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের তারা স্থির। চাপা গলায় সে বলল, 'রাহুল চ্যাটার্জী।'

কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল অমিত।

একটু চুপ করে থেকে সতী আবার বলল, 'দাদা যে কোম্পানিতে কাজ করে তার একজন ইণ্ডিয়ান ডিরেকটর।'

অদ্ভুত এসোসিয়েশনের মতো আরেকটি কথা মনে পড়ে গেল অমিতের। সে বলল, 'সেদিন ডিনারে গিয়েছিলে ?'

সতী হকচকিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত আর অস্থির দেখাল তাকে। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত গলায় সে বলল, 'যেতে হয়েছিল।'

আর কিছু বলবার ছিল না। অবশ্য অমিতের জানতে ইচ্ছা করছিল, যেতেই যদি হয়েছিল, তবে প্রথম দিকে কেন যেতে চায় নি সে ? কেনই বা রাহুল চ্যাটার্জীকে দেখে তার মুখ কঠিন আর ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠেছিল ? কিন্তু দীর্ঘকাল বাদে আজ দ্বিতীয় বার এসে সম্ভবত এই প্রশ্নগুলো করা শোভন নয়। অমিত বলল, 'আচ্ছা, এখন চলি—'

শেষ সিঁড়িটায় নেমে সে যখন গেট খুলতে যাবে, সতী ডাকল, 'অমিতদা—'

অমিত ঘুরে তাকাল।

'কাল আপনি কলকাতায় আসবেন?'

'ঠিক নেই। কেন বল তো?'

একটু চুপ কবে থেকে সতী বলল, 'আপনার সঙ্গে কাল একবাব দেখা হলে ভাল হত।'

অমিত জিজ্ঞেস কবল, 'দবকাব আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আসব।'

'বাড়িতে না।'

'তবে?'

'যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। প্রিন্টিং টেকনোলজির বিল্ডিং'টা চেনেন?

'দেখেছি।'

'ওটার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটেব মধ্যে। আসবেন কিন্তু—' সতী সামনের দিকে ঝুঁকে বলল।

সতী তাব সঙ্গে একা একা কাল দেখা করতে চাইছে। অমিত দুর্বল স্নায়ুতে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা অনুভব করল। গভীব গলায় বলল, 'আসব।'

॥ এগার ॥

বাস থেকে নামতেই অমিতের চোখে পড়ল, প্রিন্টিং টেকনোলজি বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সতী।

তখনও সাড়ে তিনটে বাজে নি। কিছুক্ষণ আগে তাদের বাসটা যখন গড়িয়াহাটা ওভারব্রিজের ওপর, পাশের সীটের লোকটার হাতঘড়ি চট করে একবার দেখে নিয়েছিল অমিত। তখন তিনটে বেজে দশ। ওভারব্রিজ থেকে ইউনিভার্সিটির কাছে আসতে দশ মিনিটও লাগে নি।

আজ কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। স্বচ্ছ নির্মল আকাশ দিগন্তের ফ্রেমে আঁটা ঝকঝকে আয়নার মতো দেখাচ্ছে। ফেনায়িত সোনালি রোদে চারদিক থৈ থৈ করছিল। কলকাতার এ দিকটা তখনও বেশ খোলামেলা; উজ্জ্বল নীল আকাশে ঝাঁক ঝাঁক শীতের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে।

আকাশ-পাখি-রোদ, কিছুই দেখছিল না অমিত। সতীর দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। দুবল কমজোরী নার্ভগুলোতে উত্তেজনার মতো কিছু একটা খেলে যাচ্ছিল তার।

আজও সবুজ বুটি-দেওয়া জরিপাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে সতী। সাদা রংটা ওর খুব পছন্দ। তার ওপর ঘি রঙের শাল। পায়ে সরু স্ট্র্যাপের জুতো। বাঁ হাতে চৌকো ব্যাগ, ডান হাতে একটা বাঁধানো খাতা।

কাছে এসে অমিত বলল, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?'

সতী বলল, 'দশ-বারো মিনিট।'

'খুব বেশিক্ষণ নয় তা হলে।'

সতী হেসে বলল, 'চলুন কোথাও গিয়ে বসি।'

সুবোধ মল্লিক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা গ্ল্যাস এ্যাণ্ড সেবামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছাড়িয়ে যোধপুব পার্কের উল্টো দিকে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। পর্দা-ঘেরা কেবিন দু কাপ কফি নিয়ে মুখোমুখি বসে দু জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তাবপর অমিতই প্রথম কথা বলল, 'কাল বলেছিলে, তোমাব কী যেন দবকারী কথা আছে—'

সতী তখনই উত্তব দিল না। একটু ভেবে অন্যমনস্কব মতো বলল, 'তেমন কিছু না—'

অমিতেব বিশ্বাস হল না। কাল সতীব চোখে-মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যা ছিল, যেভাবে তাকে আজ আসতে বলেছিল তাতে মনে হয়েছে সে কোন ব্যাপাবে বিপন্ন। কিংবা কিছু একটা গভীর সমস্যাব মধ্যে বয়েছে। তাব কাছে হয়তো সে কথা বলতে চায় সতী। কিন্তু পবে হয়তো ভেবে দেখেছ, বলা ঠিক হবে না। অমিত বলল, 'তবে যে কাল বলেছিলে—'

তাকে থামিয়ে সতী বলল, 'দরকাবেব কথা না বললে আপনি কি আসতেন?'

অমিত চুপ করে থাকল।

সতী আবাব বলল, 'আপনাব সঙ্গে একা-একা গল্প কববার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আসতে বলেছিলাম—'

'ও—'

সতী এলোমেলো অসংলগ্ন কথা বলে যেতে লাগল। কাল অমিতের গান তাব খুব ভাল লেগেছে, উষারও দারুণ লেগেছে, আরেক দিন তারা গানের আসব বসাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথায় কথায় শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছিল। সতী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অমিতদা আমাব একটা কাজ আছে; এক্ষুনি যেতে হবে।' তারপর কালকের মতো চাপা অস্বাভাবিক গলায় বলল, 'কাল একবার আসবেন?'

সোজাসুজি 'না' বলা গেল না। অমিত জিজ্ঞেস করল, 'গল্প করতে?'

তার চোখের ভেতর তাকিয়ে সতী বলল, 'ধরুন তাই—'

তারপর আরো দু দিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এল অমিত। প্রথম দিন ওরা রেস্তোরাঁয় বসেছিল। পরের দু দিন যোধপুর ঢাকুরিয়া ছাড়িয়ে গড়িয়াহাটা ওভারব্রিজ পার হয়ে লেকে চলে এসেছিল। এই দু দিনও এলোমেলো গল্প করে গেল সতী। তারই মধ্যে অমিতের মনে হচ্ছিল, সতী তার সঙ্কট বা সমস্যার কথা বলতে চায়। কিন্তু বলবে কি বলবে না, কিছুতেই সেটা স্থির করে উঠতে পারছে না।

তৃতীয় দিন লেক থেকে ফেরার সময় সতী বলল, 'কাল আমার গানের ক্লাস আছে, ভাবছি ক্লাসটা করব না।'

ও কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল অমিত।

সতী বলল, 'কাল সকালে, ধরুন ন'টায় আমাদের গানের স্কুলের কাছে আসতে পারবেন?'

এ ক'দিন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো রানীবাজার থেকে যাদবপুর, যাদবপুর থেকে রানীবাজার ছোটাছুটি করছে অমিত। সম্মোহিতের মতো সে বলল, 'পারব।'

পরের দিন সতীদের গানের স্কুলের কাছে আসতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সতী তাকে নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের একটা ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

পার্কের সবুজ ঘাস থেকে শীতের সব শিশিরকণা এখনও মিলিয়ে যায় নি। ওধারে টেনিস কোর্টটা ফাঁকা পড়ে আছে। আজ ছুটির দিন। চারদিকের মানুষজন, ট্রাম-বাস, অঢেল শীতকালীন রোদ— সব কিছুর গায়ে অজস্র আলস্য জড়ানো। অমিতের মনে পড়ল, বহুকাল বাদে এমনই এক ছুটির দিনে সেদিন সতীর সঙ্গে এ পাড়াতেই দেখা হয়েছিল।

সতী আজ আর অসংলগ্ন গল্প জুড়ে দিল না। তার গম্ভীর অন্যমনস্ক মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেই দবকারী কথাটা বলার জন্য সে মনঃস্থির করে নিচ্ছে। ভেতবে ভেতরে অমিত উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল।

সতী নতচোখে বসে ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'রাহুল চ্যাটার্জিকে তো সেদিন আমাদের বাড়িতে দেখেছেন। কি রকম মনে হয়েছিল?'

অমিত ভেবে বলল, 'একদিন কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছি। ওইটুকু সময়েব মধ্যে কি আব মনে হতে পারে! 'তবে—'

'কী?'

'যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলতে চাই।'

'মনে করব কেন? আপনি বলুন—'

অমিত বলল, 'ভদ্রলোক তোমাকে ডিনারে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করছিল, এটা আমাব ভালো লাগে নি।'

সতীর মুখে কালচে ছায়ার মতো কিছু একটা স্থিব হয়ে রইল। থমথমে ভারী গলায় সে বলল, 'লোকটা খুব খারাপ।'

অমিত সেটা ভাসাভাসা-ভাবে আন্দাজ কবেছিল। বলল, 'কী ব্যাপার বল তো? জ্যোতিকে দেখলাম লোকটাকে দারুণ ফ্ল্যাটারি করছে।'

সতী থেমে থেমে টুকরো টুকরো ভাবে যা বলল তা এই রকম। রাহুল চ্যাটার্জি লোকটা প্রথম শ্রেণীর ডিবচ, তার স্ত্রীলোকঘটিত দুর্বলতা সম্বন্ধে লিখলে আস্ত একখানা মহাভারত হয়ে যায়। নিজেব স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছে। শোনা যায় তার মৃত্যুটা নাকি স্বাভাবিক নয়। অনেকের ধারণা ওটা হত্যাকাণ্ড এবং এই জঘন্য কাজটা রাহুল চ্যাটার্জির হাত দিয়েই ঘটেছে। দুটি ছেলে আছে তার, তারা দার্জিলিং না কার্সিয়ং, কোথায় যেন কনভেন্টে থেকে পড়ে আর এই লোকটা নিউ আলিপুরে তার প্রকাণ্ড বাড়ি, গণ্ডা গণ্ডা

বয়-বেয়ারা নিয়ে একা একাই থাকে। অবশ্য রাতটা 'একা কাটায় না। সে জন্য প্রচুর স্বাস্থ্য আর অঢেল যৌবন রয়েছে, প্রতি রাত্রে এমন একটি করে মেয়ে চাই তার।

অবশ্য ইদানীং যে কোম্পানির সে ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টর তার অফিসারদের স্ত্রী-বোন-টোনেব দিকে লোকটার নজর পড়েছে। সব অফিসার নয়, দু-চারজন আছে যারা স্ত্রী বা বোনকে এগিয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে চাইছে, যেমন সতার দাদা জ্যোতির্ময়।

জ্যোতির্ময় একজন জুনিয়র গ্রেডের অফিসার। পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টে একটা বড় পোস্ট সম্প্রতি খালি হয়েছে, সেখানে এ্যাপয়েন্টমেণ্টে দেওয়া হবে। জ্যোতির্ময় ওটা পাবার জন্য প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। তার যা কোয়ালিফিকেশন বা অন্যান্য যোগ্যতা তাতে ওই পদটা পাবার কথা নয়। জ্যোতির্ময় তাই সোজা রাস্তায় না গিয়ে কিঞ্চিৎ ঘুরপথ ধরেছে। রাহুল চ্যাটার্জিকে বাড়িতে এনে সতীকে বার বার সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। কেন না তার সুপারিশের জোরে ওই পোস্টটা জ্যোতির্ময় পেয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টের খান্না কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নিয়মিত ধরনা দিয়ে যাচ্ছে। তারও উদ্দেশ্য একই, ওই পোস্টটা যেভাবেই হোক চাই। এই কোম্পানির যে কোন এ্যাপয়েন্টমেণ্টের ব্যাপারে জেনারেল ম্যানেজারের অনেকটা হাত আছে। তা ছাড়া জেনারেল ম্যানেজার লতায় পাতায় খান্নার কিরকম আত্মীয় যেন হয়। মোট কথা, ওই পোস্টটার জন্য খান্নার সঙ্গে একটা অঘোষিত যুদ্ধে নেমে গেছে জ্যোতির্ময়। দু-একদিন পর পর রাহুল চ্যাটার্জিকে বাড়ি নিয়ে আসে সে। আর ওই লোকটার বায়নাক্কার শেষ নেই। আজ ডিনার, কাল লাঞ্চ, পরশু পার্টি, তরশু ক্লাব। সতী যেতে চায় না, রাহুল চ্যাটার্জি বিনয়ের অবতারটি সেজে প্রচুর অনুনয় করে, যেন সতী সঙ্গে গেলেই সে

কৃতার্থ হয়ে যাবে। আর জ্যোতির্ময় জোরজার করে তাকে যেতে বাধ্য করে।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় জ্যোতির্ময় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু ক্লাবে কিংবা পার্ক স্ট্রিটের কোন এয়ার কণ্ডিশাণ্ড রেস্তোরাঁয় নিয়েই সতীকে রাহুলের সামনে বসিয়ে কোন এক ছুতোয় উঠে চলে যায়, এক দেড় ঘণ্টার আগে আর ফেরে না।

রাহুল চ্যাটার্জি এখনও কোনরকম অসভ্যতা বা ইতরামি করে নি। তার পদ্ধতি হয়তো মাকড়সাব মতো, অন্তত সতীর ক্ষেত্রে। সতীকে ফাঁদে ফেলবার জন্য নিঃশব্দে জাল পেতে যাচ্ছে লোকটা। এখানে তার ধীরে চলার নীতি।

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল অমিতের। দারুণ অসুস্থ লাগছিল নিজেকে। রুগ্ন স্নায়ুগুলো ভয়ানক দপ দপ করছিল। উত্তেজিতভাবে অমিত বলল, 'জ্যোতি এত নিচে নেমে গেছে!'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যই হয়তো হাঁপাচ্ছিল সতী. অমিতের কথার উত্তর দিল না।

অমিত আবার বলল, 'এ আমি ভাবতেই পারি না।'

অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বলল সতী, বোঝা গেল না।

অমিত এবার বলল, 'মাসিমা মেসোমশাই এসব জানেন?'

'সবটা না হলেও খানিকটা জানেন।'

'ওঁরা কিছু বলেন না?'

'কি বলবেন। ওঁরা অসুস্থ, অসহায়। দাদার টাকায় সংসার চলে। তার ওপর কে কথা বলবে?'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'তুমি তো শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে; এটা মেনে নিচ্ছ কেন?'

সতী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

সেটা ভাববার বিষয়। কী করতে পারে সতী? অনেক কিছুই

অবশ্য করা যায়। বাড়ি থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে সতী; জ্যোতির্ময়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে কিন্তু সেরকম মানসিক জোর বা ব্যক্তিত্ব হয়তো তার নেই। কাউকে বিয়ে-টিয়ে করেও এ বাড়ি ছেড়ে দিতে পারত সতী। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, এর মধ্যে একটা প্রেমট্রেমও করে উঠতে পারেনি? নিজে না পারুক, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, ওর মা-বাবারও তো বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। শেষের কথাটা মনে হতেই অমিত সেটা বলেও ফেলল।

মুখ নামিয়ে সতী বলল, 'সে কথাও বাবা ভেবেছিল কিন্তু হাতে পয়সা নেই। এমনি এমনিতে তো বিয়ে হয় না।'

'রিটায়ারমেণ্টের পর মেসোমশাই প্রভিডেন্ট ফ্যাণ্ড গ্র্যাচুইটির টাকা পান নি?'

'পেয়েছিলেন।'

'সে টাকা কোথায়?'

'দাদা নানা কাণ্ড করে বার করে নিয়েছে। বাবা এখন পপার, দাদার দয়ার ওপর নির্ভরশীল।'

একটু চুপ।

তারপর সতী বলল, 'এখন আমি কী করব বলুন—'

অমিত বুঝতে পারছিল না, সতীকে কী পরামর্শ দেবে। একই সঙ্গে সে বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। বি এস-সি পড়ার সময় অমিতদের বাড়ি প্রায়ই যেত সে। তখন কত আর বয়স সতীর, খুব বেশি হলে সতের-আঠার। তার গান ভালবাসত মেয়েটা, তাকে দেখলে সতীর বড় বড় স্বচ্ছ চোখে খুশি ছলকাতে থাকত। সরল নিষ্পাপ বালিকার মতো ছিল তার উচ্ছ্বাস। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সতীর পরিচয়ের সীমানা এবং বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যার

ওপর নির্ভর করে এসব কথা বলতে পাবে সতী ? এ জাতীয় সমস্যায় কারো সাহায্য পেতে পাবে ?

সতী কি তাব কাছে কিছু চাইছে ? কোনবকম সহায়তা ? অমিত বলল, 'আমি একটু ভেবে দেখি—

সতী বিষাদেব স্বরে বলল, 'যা ভাববার একটু তাড়াতাড়ি ভাবুন। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। একদিন আমি ঠিক বাড়ি থেকে চলে যাব। নইলে দেখবেন ডজন খানেক স্লিপিং পিল খেয়ে মবে পড়ে আছি।'

অমিতেব মেরুদণ্ডেব কাছে কোন একটা জায়গা যেন কাঁপতে লাগল। রুদ্ধ গলায় সে বলল 'দূর, ওসব কথা ভাবতে নেই।'

সতী বলল, 'আপনাকে সব কথা বলেছি। বলুন আমাদেব বাড়িটা আমাব পক্ষে নিবাপদ কিনা ?' বলতে বলতে সোজা অমিতের চোখেব ভেতব তাকাল সে।

অমিত জড়ানো গলায় বলল, 'তবু বাড়ি তো। মাসিমা মেসোমশাই কিংবা তোমাব বৌদি, ওঁবা কত ভালোমানুষ।'

'সব ঠিক। কিন্তু আমাকে প্রোটেক্ট কবাব ক্ষমতা ওদেব কতটুকু! ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস কবি, গানেব স্কুলে যাই—সবই করি কিন্তু তাবই মধ্যেই সবসময ভাবি, বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে যদি থাকতে পাবতাম। আমাব একটা শেলটাব দবকাব অমিতদা।'

'ঠিক আছে, দেখি কী কবা যায়—'

আরো কিছুক্ষণ পব ওবা উঠে পড়ল। সতী জিজ্ঞেস করল, 'আবাব কবে দেখা হবে ?'

অমিত বলল, 'তুমি যেদিন বলবে—'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন আসবেন।

'আচ্ছা।'

॥ বারো ॥

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠল সতী। আজ সে গানের স্কুলে যাবে না। আর দূরমনস্কর মতো ল্যান্সডাউনের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল অমিত। ভেতরে ভেতরে দারুণ অস্থিরতা অনুভব করছিল সে। ওই রকম একটা সমস্যায় সতীকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? সতী বাইরে কোথাও একটা নিরাপদ আশ্রয় চাইছে। তেমন আশ্রয় অমিত কোত্থেকে দেবে? চাকরি নেই বাকরি নেই, সে নিজেই তো একটা পরগাছা। ভাইদের রোজগারে ভাগ বসিয়ে বেঁচে আছে। তার যদি কোনরকম একটা চাকরি থাকত।

সাত আট বছরে এ অফিস সে অফিস আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরে ঘুরে পায়ের তলার এক ইঞ্চি চামড়া ক্ষইয়ে ফেলেছে অমিত। কিন্তু এবার তার একটা কাজ চাই। বিদ্যুৎচমকের মতো তার ভাবনার ভেতর কিছু একটা খেলে যেতে লাগল। যে কোন উপায়েই হোক, চাকরি কিংবা পয়সা উপার্জনের রাস্তা বার করতে না পারলে তার চলছে না। রুগ্ন স্নায়ুর ভেতর সে যেন প্রতিধ্বনি শুনতে লাগল, সতীকে বাঁচাতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে এলগিন রোডের কাছে চলে এসেছিল অমিত। একটা প্রকাণ্ড মিলিটারি ট্রাকের আচমকা ব্রেক কষার শব্দে সে চমকে উঠল। তারপরেই স্থির করে ফেলল, চেনাশোনা যত লোক আছে যারা চেষ্টা চরিত্র করলে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে বলে তার বিশ্বাস, ওদের সবার কাছে আজ আরেক বার যাবে। তার-কেশ্বরে হত্যে দেবার মতো তাদের বাড়ির সামনে পড়ে থাকলে কিছু ফল কি পাওয়া যাবে না?

দুপুর হয়ে আসছিল; সূর্যটা এখন খাড়া মাথার ওপর।

পাকস্থলীর ভেতর খিদেটা ক্রমশ গনগনে হয়ে উঠছে, হতো দেবার আগে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া দরকার।

দুপুরবেলা কলকাতায় থাকলে অমিত যা করে, সাউথ ইণ্ডিয়ান হোটেলে সস্তায় খাওয়াটা চুকিয়ে ফেলল। তারপর বাগবাজার দমদম, বেলেঘাটা, পাকসার্কাস—চেনাশোনা যত লোকের নাম ভাবতে পাবল, সবার বাড়িতে একবার করে হানা দিল। ছুটির দিন, তাই বেশির ভাগকেই বাড়িতে পাওয়া গেল না। কেউ কেউ বাড়িতে থেকেও চাকর-বাকর দিয়ে বলে পাঠাল, বাড়িতে নেই আর যাদের দেখা পাওয়া গেল, তারা গভীর সহানুভূতি জানিয়ে বলল, আপাতত তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাক, ভবিষ্যতে যদি কোন সুযোগ হয়।

গোটা কলকাতায় প্রায় সারাটা দিন এবং রাতের অনেকটা সময় কাটিয়ে অমিত যখন শিয়ালদা নর্থ স্টেশনে এল, তার চোখ দেড় ইঞ্চি গর্তে ঢুকে গেছে, জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষিত, মেরুদণ্ড বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। সে দেখল, সামনের প্রকাণ্ড গোল ঘড়িটায় এখন দশটা বত্রিশ। অর্থাৎ লাস্ট ট্রেন ছাড়তে মিনিট তিনেক বাকি। টিকেট কেটে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে এল অমিত। তারপর শেষ দিকের একটা কম্পার্টমেণ্ট উঠতে না উঠতেই লাস্ট ট্রেন ছেড়ে দিল।

॥ তের ॥

রানীবাজার পৌঁছে অমিত দেখল, স্টেশনে আলো জ্বলছে না। শুধু স্টেশনে কেন, বাইরে শহরের যেদিকে যতদূর চোখ যায় কোথাও আলো নেই, কুয়াশা আর পাতলা অন্ধকারের তলায় সব ডুবে আছে। তার মানে আজও এদিকটায় লোড শেডিং হয়েছে। এটা কিছু নতুন ঘটনা নয়। চা খাওয়া, দাড়ি কামানো, আহার-নিদ্রা-মৈথুন ইত্যাদির মতো এ শহরের বাসিন্দাদের লোড শেডিং-এর দৌলতে অন্ধকারে থাকা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

লাস্ট ট্রেনে রানীবাজারের লোক খুব কমই থাকে। অন্ধকার নিঝুম প্ল্যাটফর্মে বারো-চোদ্দটি যাত্রী নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এলোমেলো পা ফেলে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে অমিত গেটের দিকে এগিয়ে চলল। ভাবল, আজ আর দেড়-দু মাইল হেঁটে বাড়ি যাবে না ; একটা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে নেবে।

এত রাতে টিকিট নেবার জন্য রেলের লোকজন কেউ ছিল না। গেট পেরুতে পেরুতে অমিত দেখল, ট্রেনের সামনের দিকের কামরা-গুলো থেকে যারা নেমেছিল তারা একেকটা রিক্সা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

এক মিনিটের মধ্যে রিক্সা স্ট্যাণ্ডটা ফাঁকা হয়ে গেল। অমিত ভাবল, নাঃ, শেষ পর্যন্ত হেঁটেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। কিছুটা হতাশই হল সে ; ক্লান্ত শরীরে এখন আর হাঁটতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু কি আর করা যাবে। মেরুদণ্ডের মতো সেই রাস্তাটার দিকে যেতে যেতে আচমকা অমিতের চোখে পড়ল, ওধারে ঝাঁকড়া-মাথা পাকুড় গাছের আড়ালে এখনও একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় দৌড়েই কাছে চলে গেল। রিক্সাওলাকে তাদের পাড়ার নাম করে জানতে চাইল, যাবে কিনা ?

রিক্সাওলা কিছু বলবার আগেই রিক্সার ছাউনির তলা থেকে মেয়ে-গলা শোনা গেল, 'সেখানেই তো যাচ্ছে।'

অমিত চমকে উঠেছিল। কুয়াশা আর অন্ধকার যেমন আছে তেমনি মেটে মেটে পাতলা জ্যোৎস্নাও আছে। ঝাপসা আলোয় তার চোখে পড়েছিল, রিক্সার ভেতর নীলা বসে আছে।

নীলা আবার বলল, 'আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি না থাকলে উঠে আসুন—'

নীলাব সঙ্গে এক রিক্সায় কোনদিন কোথাও যায় নি অমিত। তা ছাড়া ওর যা দুর্নাম তাতে পাশে বসে যাওয়াটা ঠিক হবে কি? ঠাণ্ডা রক্ত থেকে এক ধরনেব ভীরুতা উঠে এসে তাকে যেন আটকাতে লাগল। আবার এতটা বাস্তা হেঁটে যাবার মতো শক্তিও শরীবে অবশিষ্ট নেই। দ্বিধান্বিতের মতো একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল অমিত। তারপর রিক্সায় উঠে নীলাব পাশে নিজেকে গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা ছুটতে শুরু করল।

ঘাড়ের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল নীলা, 'রাত বলেই সঙ্গে নিয়ে এলাম। কেউ তো আর দেখতে পাবে না। দিনের বেলা হলে হাজার হাজার চোখের সামনে দিয়ে আপনাকে কিছুতেই নিয়ে যেতাম না। আমাব মতো একটা মেয়ের সঙ্গে ওভাবে কি যাওয়া চলে! আপনিই বলুন না—'

অমিত কী বলবে, ভেবে পেল না।

নীলা এবার বলল, 'আমার পাশে বসে যেতে ঘেন্না হচ্ছে না তো?'

এই কথাটা আগেও কবে যেন একবার বলেছে নীলা। অমিত হকচকিয়ে গেল, 'না, ঘেন্না হবে কেন?'

একটু চুপ। তারপর নীলা বলল, 'কলকাতা থেকে ফিরতে আজ এত দেরি হল আপনার?'

চাকরির ব্যাপারে যে ছোটাছুটি করতে হয়েছে সেটা আর বলল

না অমিত। শুধু বলল, 'কয়েক জনের সঙ্গে দেখা টেখা করতে হয়েছে ; কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। আপনারও তো ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে।' বলেই ভাবল নীলাকে সে 'তুমি' না 'আপনি' করে বলত ? ঠিক মনে করা গেল না।

অন্ধকারে তীক্ষ্ণ রিনরিনে শব্দ করে নীলা হাসল, 'আপনি তো জানেন, আমি রোজ এই সময়েই ফিরি। নাইট ডিউটি দিয়ে লাস্ট ট্রেনের আগে ফেরা যায় না।'

অমিত উত্তর দিল না। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল।

নীলাও আর কিছু বলল না।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন। হু-হু উত্তুরে হাওয়া আড়াআড়ি ছুটছিল। দুধারে বাড়িঘর দোকানপাট, কিংবা ফাঁকা মাঠ, উঁচু-উঁচু গাছপালা কালিতে জেবড়ে-যাওয়া জবড়জং ছবির মতো মনে হচ্ছে। এ শহরে কেউ আর জেগে নেই। অমিতরা যেন পাতালের কোন অন্ধকার পরিত্যক্ত নগরে এই মাঝরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারাদিনের এত ক্লান্তি, চাকরির জন্য চারদিকে ঘোরাঘুরি কিংবা সতীর ভয়াবহ সমস্যা, এখন কিছুই আর মনে পড়ছে না অমিতের। রাস্তার দিকে তাকিয়ে শীতের আবছা চালচিত্র দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে নীলার কথাই সে ভাবতে লাগল।

নীলারা এ শহরের আদি বাসিন্দা নয়। ওদের বাড়ি পুব বাংলায়। পার্টিসনের অনেক পর দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেছিল। দেশ ভাগের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গে হু-হু করে লোক বাড়ছিল। পপুলেসন একসপ্লোসান যাকে বলে। কলকাতার গাদাগাদি ভিড় ক্রমশ শহরতলী, শহরতলী ছাড়িয়ে চারদিকের ছোটখাটো শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই উপচে-পড়া স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে নীলারা ছ-সাত বছর আগে রানীবাজারে চলে এসেছিল এবং অমিতদের পাশের রাস্তায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল।

পাঁচজন নিয়ে ওদের মাঝারি আকারের পরিবার। বাবা-মা

আর নীলারা তিন ভাইবোন। ভাইবোনদের মধ্যে নীলাই বড়, তারপর এক বোন, ভাইটা সবার ছোট।

নীলার বাবা রাধামোহন মজুমদার একটা কারখানার লেজার কীপার ছিল তখন। টেনেটুনে পাঁচজনের সংসারটা কোনরকমে চালিয়ে নিয়ে যেত। নীলা তখন প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ছোট বোন কাজল এখানকার বিনোদিনী গার্লস হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিল আর ছোট ভাই নান্টু ছেলেদের স্কুলে ক্লাস ফাইভে। সেবার অমিতের বি এস-সি ফাইনাল ইয়ার।

মনে আছে, মা-ই ওদের সঙ্গে গিয়ে প্রথম আলাপ করেছিল। সেই সূত্রেই অমিতদের বাড়িতে ওদের যাওয়া-আসা শুরু হয়েছিল। অবশ্য তার আগেই নীলাদের, বিশেষ করে নীলাকে ছাদের ঘর থেকে দেখেছে অমিত। তখন নানা দরকারে নীলা ওদের বাড়ির ছাদে আসত। কখনও এসে জামা-কাপড় শুকোতে দিত। কখনও রোদে পিঠময় চুল ছড়িয়ে বসে থাকত। আর হঠাৎ অমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে মুখ নামিয়ে নিত। আশ্চর্য ধীর শান্ত আর নম্র স্বভাবের মেয়ে ছিল তখন নীলা।

একদিন দুপুরবেলা ছাদের ঘরে পড়াশোনা করছে অমিত। মা নীলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। নীলাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'অমু, এই মেয়েটাকে চিনিস ?'

অমিত আস্তে করে বলেছিল, 'দেখেছি।'

'ও নীলা—' দূরে নীলাদের বাড়িটা দেখিয়ে মা বলেছিল, 'ওরা ওই বাড়িটায় ভাড়া এসেছে।'

'ও—'

মা একটু ভেবে বলেছিল, 'নীলা এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। দেখিয়ে টেখিয়ে দেবার কেউ নেই ; তুই যদি একটু দেখাস—'

অমিত বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু মেয়েটা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে

আছে। তাই সোজাসুজি মুখের ওপর 'পারব না' বলা যায় নি। ভদ্রভাবে কিছু বুঝতে না দিয়ে সে এড়াতে চেয়েছিল, 'ছ মাস পর আমার পরীক্ষা—'

মা তার এই অজহাতটা গায়ে মাখে নি। বলেছিল, 'সারাদিন তো আর পড়িস না। নীলার জন্য তোর সুবিধামতো একটু সময় করে নিস; না হলে মেয়েটা পাশ করতে পারবে না।'

অগত্যা পড়াতেই হয়েছিল। নীলার মাথা পরিষ্কার, কোন বিষয়ে দুবার তাকে বোঝাতে হত না, চটপট ধরে ফেলত। তা ছাড়া মেয়েটা দারুণ শান্ত আর নরম ধরনের বলে মোটামুটি ভালোও লাগত।

মাসখানেক বাদে একদিন জ্যামিতি বই খুলে বোঝাচ্ছে অমিত, হঠাৎ চোখে পড়েছিল নীলা একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে। বইটা মুড়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী দেখা হচ্ছে?'

দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়েছিল নীলা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আধফোটা গলায় বলেছিল, 'আপনি স্কুল ফাইনালে তিনটে লেটার পেয়েছিলেন, না?'

অমিত হেসেছিল, 'কে বললে?'

'শুনেছি। বি. এস-সি পার্ট ওয়ানে তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন?'

'এ খবরও জানা হয়ে গেছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল নীলা।

অমিত জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার সম্বন্ধে আর কী কী জানা হয়েছে?'

'আপনার মতো ভালো ছেলে রানীবাজারে আর একজনও নেই।'

'এমন দুর্দান্ত খবরটা কে দিলে?'

'সবাই—' বলতে বলতে মুখ তুলেছিল নীলা। তার চোখেমুখে শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা এবং সারল্য যেন মাখানো ছিল।

যাই হোক, অমিতের মনে পড়ছে সেবারই সে বি এস-সি আর নীলা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। তারপর দু জনেরই আর পড়াশুনো হয়নি। পড়ার খরচ চালাবার মতো অবস্থা ছিল না অমিতদের। নীলারও তাই। কেননা সে-বছরই ওর বাবাব ফ্যাক্টরিটা দুম করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে অনেক দিন চাকরিব খোঁজে দুজনে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আব নানা অফিসে অফিসে ছোটাছুটি করেছে। চার পাঁচ বছরেও যখন একটা কাজ জুটল না, নীলা তখন কাকে ধরে যেন হোটেলে হোটেলে যাতায়াত শুরু করল। বিকেলের ট্রেনে সে কলকাতায় চলে যায়, ইণ্টাবন্যাল নাইট ডিউটি সেরে কোনদিন লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফেবে সে, কখনও কখনও ফিরতে ফিরতে পরের দিন। এছাড়া সংসারটাকে বাঁচাবার আব কোন রাস্তা ছিল না তার। অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের ভেতর হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে সে, নেমেই যাচ্ছে। সেখান থেকে ফেরাব উপায় নেই।

কি ভাবে এই ব্যাপারটা রানাবাজারে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে বারুদের স্তূপে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। গোটা রানীবাজার, এমন কি অমিতের দুই ভাই সানু আর বাসু এবং তার শ্রদ্ধেয় আদর্শবাদী বাবা পর্যন্ত নীলাদের বাড়ি ছুটে গিয়েছিল। ঘাড়ে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ছাদের ঘরের জানালা খুলে অমিত দেখেছিল, প্রতিটি লোক যেন একেক জন হত্যাকারী। ওরা চিৎকার করে বলছিল, ভদ্রপাড়ায় বেশ্যাকে থাকতে দেবে না। নীলাদের বাড়ির দরজা জানালা ছিল বন্ধ; কেউ ভেতর থেকে সাড়া টাড়া দিচ্ছিল না। তখন সানু বাসুরা ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছিল। ঘণ্টাখানেক ঢিল ছোঁড়া এবং চিৎকার খিস্তির পর সবাই যখন খানিকটা ঝিমিয়ে এসেছে সেই সময় দড়াম করে দরজা খুলে

বেরিয়ে এসেছিল নীলা। তার খোলা চুল বাতাসে উড়ছিল, চোখের তারায় আগুন দপ দপ করছিল, শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছিল, বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। চিৎকার করে নীলা বলেছিল, 'আমাদের থাকতে দেবে না! ক্ষমতা থাকলে আর বাপের বেটা হলে ওঠাও। ভদ্রলোক সব! দাও—ভালভাবে বাঁচবার মতো একটা চাকরি দাও। এক্ষুনি সব ছেড়ে দিচ্ছি। কোথায় কে আছ এগিয়ে এসো, ওঠাবার আগে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।'

কি হয়ে গিয়েছিল লোকগুলোর, পিছু হটতে হটতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর সেদিন থেকেই রানীবাজারে যুদ্ধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে নীলা। এখানকার প্রায় কারো সঙ্গেই সে কথা বলে না। কাউকে গ্রাহ্য করে না, কোন কিছু তোয়াক্কা করে না। কলকাতা থেকে ফিরে রিক্সায় উঠে সিগারেট ধরিয়ে সবার নাকের ওপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে যায়।

সেদিনের সেই শ্বাসরুদ্ধ ঘটনাটার পর অমিত নীলাকে চিঠি লিখেছিল। সান্তু বান্তু এবং বাবার ব্যবহারের জন্য সে নীলার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। হয়তো সেই কারণেই কিংবা সৎ ভদ্র ভালো ছেলে বলেই তার সম্বন্ধে এখনও নীলার শ্রদ্ধা আছে। মাঝখানে কিছুদিন কথা বলে নি, আজকাল বলছে। তবে সবার সামনে নয়; কেননা তার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে অমিতের সম্বন্ধে কেউ কিছু ভাবতে পারে, সেই কারণে নীলার এই সতর্কতা।

কতক্ষণ পর অমিতের মনে নেই, পাশ থেকে নীলার গলা শোনা গেল, 'অমিতদা—'

চমকে অমিত ঘাড় ফেরাল। নীলা বলল, 'কী ভাবছিলেন?'

'কিছু না।' নীলার সম্পর্কেই যে ভাবছিল, সেটা আর জানাল না অমিত।

'চাকরি-টাকরি কিছু হল?'

চাকরির কথায় হঠাৎ সতীর কথা মনে পড়ে গেল অমিতের। নৈরাশ্য বোধ করল সে। শ্বাস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'না।'

'চাকরির খুব একটা দরকার আপনার, তাই না অমিতদা?'

অমিত হাসল, কিছু বলল না।

নীলা আবার বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলব?'

'কী?'

'আমার সঙ্গে নানা লোকের আলাপ-টালাপ হয়েছে—ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসম্যান, বড় বড় সরকারী অফিসার। আপনার চাকরির ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কথা বলব?'

অসহ্য আগ্রহের গলায় অমিত বলল, 'আপনার যদি অসুবিধা না হয় বলে দেখুন—'

কি ভেবে নীলা বলল, 'কাল একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কী?

'লাস্ট ট্রেনে আমি ফিরব। আপনি একটু কষ্ট করে স্টেশনে আসবেন?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

॥ চোদ্দ ॥

পরের দিন লাস্ট ট্রেন থেকে নীলা নামতেই অমিত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীলা বলল, 'এসেছেন তা হলে—'

অমিত বলল, 'আসবারই তো কথা ছিল।'

'তা অবশ্য ছিল।'

কুয়াশা-জড়ানো ঝাপসা অন্ধকারের তলায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে কাঁপা দুর্বল গলায় অমিত জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন কেন?'

'দরকার ছিল—' বলেই চুপ করে গেল নীলা।

তার গা ঘেঁষে যেতে যেতে শ্বাসরুদ্ধের মতো নীলার দিকে তাকাল অমিত। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারল না; অনেকটা উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল ডেলা পাকিয়ে গলার ভেতর আটকে রইল।

স্টেশনের বাইরে এসে অমিতকে নিয়ে রিক্সায় উঠল নীলা। চওড়া সোজা রাস্তা ধরে কয়েক মিনিট যাবার পর সে বলল, 'একটা ভালো খবর আছে?

এতক্ষণে বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে এল অমিতের। কুয়াশা-ভেজা শীতের সজীব হাওয়া ফুসফুসে টেনে নিয়ে সে বলল, 'কী খবর?'

'পরশুদিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় আপনার কী কাজ আছে?'

'কিছুই না।'

'তা হলে শিয়ালদা স্টেশনে এনকোয়ারির কাছে ওই সময়টা থাকবেন। আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।'

নীলার দিকে অনেকটা ঝুঁকে চাপা ভীরু গলায় অমিত বলল, 'চাকরিটা হবে?'

নীলা হাসল, 'দেখা যাক।'

কথামতো পরশুদিন সন্ধ্যে ছ'টায় শিয়ালদার এনকোয়্যার থেকে অমিতকে এসপ্ল্যানেডের ওধারে বিশাল এক হোটেলে নিয়ে এল নীলা। এই হোটেলটা বাইরে থেকেই দেখেছে অমিত; ভেতরে কোনদিন ঢোকে নি। চারদিকে আলো, আলোর মধ্যে কিউরিও শপ, জুয়েলারি আর পোশাকের দোকান, অসংখ্য শো-উইণ্ডোতে এয়ার লাইনসের বিজ্ঞাপন, নানারকম ডেকরেশন পীস, ফিলিগ্রি আর হাতির দাঁতের দামী দামী জিনিস, এ ছাড়া দারুণ সাজানো রিসেপসানে ফিল্মস্টারদের মতো সুন্দরী স্মার্ট তরুণী, ঝকঝকে পোশাক-পরা ফ্লোর বয়, স্টুয়ার্ট, ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছয় ইঞ্চি পুরু মহার্ঘ কার্পেটে পা ডুবিয়ে আচ্ছন্নের মতো নীলার সঙ্গে গিয়ে লিফটবক্সে ঢুকল অমিত। দু মিনিটও লাগল না, ওরা তিনতলার একটা স্যুইটে পৌঁছে গেল।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে যে দাঁড়াল তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভারী রোমশ শরীর। দুর্দান্ত কালো। পুরু ঠোঁটের ওপর ছাঁটা গোঁফ, গাল নিখুঁত কামানো। পরনে দামী টেরিলিন-এর স্যুট, লাল টাই, চোখে হেক্সাগোনাল ফ্রেমের সৌখিন চশমা। নীলার দিকে তাকিয়ে তার চোখ হাসিতে চিকচিকিয়ে উঠল। হাসিটা লালচে ঘোলাটে চোখ থেকে ক্রমশ গালে, গাল থেকে পুরু ঠোঁটের ওপর দিয়ে চৌকো শক্ত থুতনির খাঁজে নেমে অনড় হয়ে রইল। উচ্ছ্বাসের গলায় লোকটা বলল, 'কাম অন ডার্লিং—'তার স্বর ভাঙা এবং স্খলিত। এক পলকেই টের পাওয়া যায় এই সন্ধ্যেরাত্তিরে লোকটা কয়েক পেগ হুইস্কি পাকস্থলীতে চালান করেছে।

নীলা অমিতকে দেখিয়ে বলল, 'মিস্টার মালহোত্রা, কাল আপনাকে যার কথা বলেছিলাম ইনি—'

'অলরাইট, অলরাইট। আমার মনে আছে—' দ্রুত একবার

অমিতকে দেখে নিয়েই মালহোত্রা নীলার দিকে ফিরল 'এসো তোমরা—'

মালহোত্রার সঙ্গে স্যুইটের সুসজ্জিত একটা ঘরে গিয়ে ওরা বসল। আর বসেই মালহোত্রা বলল, 'এর ব্যাপারটা আগে সেরে [illegible]। কি যেন—ও একটা চাকরি।' বলতে বলতেই অমিতের দিকে ফিরল, 'নীলা আপনার চাকরির জন্য আমাকে ধরেছে ; ওর রিকোয়েস্ট আমি ফেলতে পারব না। এনিওয়ে আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন?'

লোকটা জলের মতো বাংলা বলে। হয়তো বহুকাল কলকাতায় আছে। জন্মটন্মও এখানেই হতে পারে। অমিত নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। শিথিল গলায় বলল, 'বি. এস-সি পাশ করেছি।'

নীলা পাশ থেকে বলল, 'ফিজিক্স অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে।'

মালহোত্রার চোখেমুখে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। যান্ত্রিক ভারী গলায় সে অমিতকে জিজ্ঞেস করল, 'টাইপ জানেন?'

অমিত বলল, 'জানি।'

'গুড। আমার একজন টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্কের দরকার। কাল এ্যাপ্লিকেসন লিখে আমার অফিসে আসবেন। আচ্ছা—'

অমিত বুঝল, মালহোত্রা যত তাড়াতড়ি সম্ভব তার ব্যাপারটা শেষ করতে চায়। পরিষ্কার সেটা সে জানিয়ে দিয়েছে, এবার তাকে উঠতে হবে। অমিত উঠেও পড়ল। বলল, 'নমস্কার স্যর—'

মালহোত্রা গ্রাহ্য করল না, টাইপিনটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করতে লাগল।

নীলাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অমিতকে নিয়ে হোটেলের বাইরে চলে এল নীলা। বলল, 'আপনি বাড়ি চলে যান।'

অমিত অবাক, 'আপনি?'

'আমার নাইট ডিউটি আছে না?' নীলা বিষণ্ণ হাসল। হেসেই হোটেলের ভেতরে আবার ফিরে গেল।

অমিত কিন্তু বাড়ী যেতে পারল না। প্রথমে চাকরিটার জন্য সে নীলার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল। পরেই তার মনে হল, নিজের শরীরের দামে মেয়েটা কি এই চাকরিটা তাকে জুটিয়ে দিল? উদ্‌ভ্রান্তের মতো হোটেলের এ প্রান্ত থেকে হাটতে হাটতে ও প্রান্ত পর্যন্ত যায় অমিত, আবার এ প্রান্তে ফিরে আসে। যতক্ষণ না নীলা বেরিয়ে এল, সে হাঁটতেই লাগল, হাঁটতেই লাগল।

রাত দশটায় হোটেলের বাইরে অমিতকে দেখে থমকে দাঁড়াল নীলা। একটু পর কাছে গিয়ে বলল, 'এ কি, আপনি বাড়ি যান নি!'

অমিত বলল, 'আপনাকে ফেলে যেতে পারলাম না।'

পরিপূর্ণ স্থির চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীলা। তারপর আস্তে করে বলল, 'চলুন, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

এখান থেকে আপাতত শিয়ালদা যেতে হবে। সামনের রাস্তা পেরিয়ে শিয়ালদার বাসে উঠে ওরা পাশাপাশি বসল।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। জানালার বাইরে তাকিয়ে অমিত গতিময় শহর দেখতে লাগল। জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো মানুষ, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট কারের স্রোত, আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট—তার চোখ সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন তীব্র অনুশোচনার মতো কিছু একটা চলছিল তার। একসময় মুখ ফিরিয়ে নীলার দিকে তাকাল অমিত। নীলা জানালার বাইরে নানা দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মতো নীলাকে দেখল অমিত। তারপর নিজের অজান্তেই যেন ডেকে উঠল, 'শুনছেন—'

নীলা তাকাল। অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝতে চেষ্টা করল। বলল, 'কিছু বলবেন?'

অমিত গভীর গলায় বলল, 'নিজের ক্ষতি করে আপনি আমার চাকরিটা করে দিলেন—' তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

নীলা তখনই কিছু বলল না। অমিত কী বলতে চায়, সে বুঝল। হাত বাড়িয়ে অমিতের একটা হাত ছুঁল নীলা, ছুঁয়েই থাকল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'আপনার জন্যে নতুন করে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি। যা হবার ফ্যামিলির জন্যে অনেক আগেই হয়ে গেছে। আপনি কষ্ট পাবেন না; মালহোত্রার কাছে আমাকে আসতেই হত। এলামই যখন সুযোগটা নিয়ে নিলাম।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি অমিতদা। আপনি এত ভালো, এত অনেস্ট—বি. এস-সি পাশ করার পর কত বছর বেকার বসে আছেন! আমার কী কষ্ট যে হত! যাক এতদিনে একটা কিছু হতে যাচ্ছে। আমার কি ভালো যে লাগছে।'

অমিত কিছু বলতে চাইল, পারল না। দুরন্ত আবেগে তার কণ্ঠস্বর বুজে গেল।

॥ পনেরো ॥

পরের দিনই নীলার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ক্যামাক স্ট্রীটে মালহোত্রার অফিসে এল অমিত। সঙ্গে টাইপ-কবা দবখাস্ত আর বি এস-সি এবং স্কুল ফাইনালেব সার্টিফিকেট দু-খানা নিয়ে এসেছিল।

মালহোত্রা কাগজপত্রগুলো দশ সেকেণ্ডও দেখল না, কোন ইণ্টারভিউও নিল না। বেল টিপে একটি মধ্যবয়সী লোককে ডাকিয়ে এনে তৎক্ষণাৎ কোম্পানির প্যাডের কাগজে অমিতের নামে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার টাইপ করে আনতে বলল। পাঁচ মিনিটেব মধ্যে লোকটা টাইপ-কবা কাগজ নিয়ে ফিরে এল। মালহোত্রা তার ওপরে দ্রুত সই কবে অমিতেব হাতে দিতে দিতে বলল, 'কাল থেকে জয়েন করুন।'

সমস্ত ব্যাপারটা ম্যাজিক মনে হল অমিতেব। এবং অবিশ্বাস্যও। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা হাতে পাবাব পরও সে ভাবতে লাগল, এই মুহূর্তে যা ঘটল, খুব সম্ভব তা সত্যি নয়। সে বোধহয় একটা অলৌকিক ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখছে।

কাজ হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছন্নের মতো উঠে দাঁড়াল অমিত। ঘাড় নুইয়ে বিনীত স্বরে বলল, 'নমস্কাব স্যব—'

মালহোত্রা ফিরেও তাকাল না, টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অপারেটরকে কি নির্দেশ দিতে লাগল।

ক্যামাক স্ট্রীটের চোদ্দ তলা অফিস-বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আরেক বার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা দেখল অমিত। টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্কের কাজই তাকে দেওয়া হয়েছে। বেসিক পে আপাতত দু শো

ডি-এ এবং অন্যান্য এ্যালাউন্স নিয়ে সাড়ে চার শোর মতো পাবে সে। বার্ষিক ইনক্রিমেণ্ট পনের টাকা করে।

অমিত ভাবল, কত সহজে এখানে চাকরি পাওয়া যায়। অথচ একটা কাজের জন্য সাত আট বছর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কত ঘুরেছে সে, ঘুরতে ঘুরতে জীবনশক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। একটা অন্ধকারের বৃত্ত চারপাশ থেকে ছোট হতে হতে তাকে যেন ঘিরে ফেলেছিল। মনে হচ্ছিল বায়ুশূন্য ঘরে সে আটকে আছে। আর আজ [illegible] মানুষের [illegible] ভিড অর্থাৎ সেই পপুলেসন [illegible] টন [illegible] পাহাড়, হাজার হাজার [illegible], মলমূত্র, [illegible], মিছিল, দম-আ[illegible] — [illegible] এই শহর, এই কলকাতা যেন অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। [illegible] আকাশ আজ কত উদার, সূর্যালোক কি উজ্জ্বল, বাতাসে কি [illegible] অক্সিজেন। অমিত হাঁটবে বলে এই ক্যামাক স্ট্রীট, ওধারের লোয়ার সার্কুলার রোড দরাজ বুক পেতে রেখেছে। জীবনে এই প্রথম, হ্যাঁ প্রথমই তো, দুর্বল স্নায়ুতে দারুণ উত্তেজনা টের পেতে লাগল অমিত। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কোথায় কি একটা মেলায় গিয়ে নাগরদোলা চড়েছিল সে। ভীষণ ভাল লেগেছিল। তেমনই ঘূর্ণ্যমান এক আনন্দ রক্তস্রোতে অনুভব করতে লাগল সে।

হাঁটতে হাঁটতে সার্কুলার রোড পেরিয়ে কখন ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়েছে, অমিতের খেয়াল নেই। সে দেখল, বিকেলের রোদ ঘন হয়ে আসছে। সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি নিচে নেমে গেছে। আর তখনই সতীর কথা মনে পড়ে গেল তার। দু-তিন দিন সতীর সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ ওদের বাড়ি একবার যেতে হবে। সেদিন দেশপ্রিয় পার্কে নিজের বিপদের কথা বলেছিল সতী। হয়তো মেয়েটা তার ওপর নির্ভর করে বসে আছে, হয়তো সে তার সাহায্য চায়। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা

পাবার পর নিজের মধ্যে দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস অনুভব করছে অমিত। সতী কী ধরনের সাহায্য চায়, আজ জেনে নেবে।

একটা বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল অমিত। তার সামনে দিয়ে পাঁচ মিনিটে তিনটে বাস হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। অফিস ছুটি হতে এখনও কিছু দেরি কিন্তু এরই মধ্যে বাসগুলো বোঝাই হয়ে আসছে। হ্যাণ্ডেলে বা ফুটবোর্ডে এমন ফাঁক নেই যেখানে হাত-পা রেখে ঝুলে যাওয়া যায়। অমিত আর দাঁড়াল না. সোজা হাঁটতে লাগল।

॥ ষোল ॥

সতীদের বাড়ি অমিত যখন পৌঁছুল, শীতের সন্ধ্যে ঘন হয়ে নেমে আসছে। কলিং বেল টিপতেই যে দরজা খুলে দিল এই মুহূর্তে তার কথা ভাবেনি সে। জ্যোতির্ময় সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিতের অস্বস্তি লাগছিল। ঢোক গিয়ে বলল, 'সতী আমাকে আসতে বলেছিল—'

ততক্ষণে জ্যোতির্ময়ের কপাল জটিল রেখায় ভরে গেছে। চোখে-মুখে স্পষ্টতই বিরক্তি। বলল, 'এসো—'

অমিত ভেতরে এসে চমকে উঠল। সেই লোকটা, রাহুল চ্যাটার্জি যার নাম—জ্যোতির্ময়দের কোম্পানির ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টর, সোফায় কাত হয়ে বসে আছে। উল্টোদিকে কোণাকুণি, ডিভানটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সতী। ঊষা বা বাড়ির অন্য কাউকে এ ঘরে দেখা গেল না।

অমিত দ্রুত লক্ষ্য করল সতীর ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, চোয়াল শক্ত, চোখে ভীত উত্তেজনা। নিশ্বাস বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে সতী জোরে শ্বাস টানল। অমিত যে এসেছে, রাহুল চ্যাটার্জি গ্রাহ্যই করল না। যেভাবে মানুষ গাছপালা পাখি আকাশ কিংবা অন্য দৃশ্যাবলী দেখে তেমন নিরাসক্তভাবে একপলক দেখেই সতীর দিকে তাকাল।

জ্যোতির্ময় নিচু গলায় অমিতকে বলল, 'আমরা আজ খুব ব্যস্ত আছি অমিত—'

পরিষ্কার সে বুঝিয়ে দিচ্ছে অমিত এখানে অবাঞ্ছিত, ওদের সময় নষ্ট না করে যেন চলে যায়। অমিত কী করবে, থাকবে না চলে যাবে, ভাবতে পারছিল না। সে শুধু বলল, 'ও—'

পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা থাকলে তার মধ্যে রাহুল চ্যাটার্জি কেন? এই লোকটা ওদের ফ্যামিলি মেম্বার নাকি? অমিত আবার বলল, 'ও—'

জ্যোতির্ময় এবাব বলল, সতীব সঙ্গে তোমাব যদি কথা থাকে সেবে নাও। তাবপব অন্য একদিন এসো—'

কিন্তু কথা বলাব সুযোগ পাওয়া গেল না। তাব আগেই বাহুল চ্যাটার্জি সতীকে বলল, 'আব 'না' বলো না সতী। প্লীজ ফব হেভেনস সেক—'

জ্যোতির্ময় অমিতেব কানেব কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে বলল, 'জাস্ট এ মিনিট, লেট দেম ফিনিশ—' অর্থাৎ বাহুলবা যতক্ষণ কথা না শেষ কবছে, অমিত যেন অপেক্ষা কবে।

এদিকে সতী বলছিল, 'আমি যাব না।'

রাহুল চ্যাটার্জি বলল, 'হোক নাইট পার্টি। ইউ উইল এনজয় সতী, আই প্রমিজ—'

'আমি যাব না, কিছুতেই না—'

অমিতেব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে জ্যোতির্ময গাঁক গাঁক কবে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন যাবি না, কেন?'

সতী বলল, 'আমাব ইচ্ছে, যাব না।'

বাহুল চ্যাটার্জি মেরুদণ্ড সোজা কবে উঠে বসল। তাব চোখ কুঁচকে যেতে লাগল, মুখ শক্ত। সে বলল, 'তুমি যাবে।'

অমিত তাকিযেই ছিল। এই নিষ্পাপ পবিত্র সতী, পৃথিবীব সব মূল্যবান মানুষ এবং সামগ্রীব চাইতেও যেন মহার্ঘ এই মেয়েটা তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। হয়তো তার ওপর এখনও নির্ভর করে আছে। তাকে দেখতে দেখতে অমিতের রুগ্ন দুর্বল অসুস্থ স্নায়ুতে হঠাৎ কি এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। গলার স্বর

যতটা উঁচুতে ওঠানো সম্ভব, তুলে চিৎকার করে উঠল, 'সতী [illegible] [illegible]য়ের চাপে যেন খাড়া উঠে [illegible]। ক্রুদ্ধ [illegible]র মুখ

[illegible] কাপুরুষ অমিতের ভেতর থেকে কে এক দুঃসাহসী [illegible] যেন এই মুহূর্তে বেরিয়ে এল। সে [illegible] আমি [redacted]-ই হই, সতী যাবে না।'

জ্যোতির্ময় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ গলায় বক্ত তুলে সে চেঁচাল, 'এত বড সাহস তোমাব! সোযাইন কোথাকাব. আমাব বাড়িতে বসে—'

অমিত বলল, 'তুই সোয়াইন। লজ্জা কবে না নিজের বোনটাকে একটা ডিবচ উল্লুকেব হাতে ঘুষ দিয়ে বড পোস্ট চাইছিস—'

বাহুল চ্যাটার্জি উন্মাদেব মতো বলল, 'স্টপ ব্যাস্টার্ড, স্টপ।' হাতে যদিও শটগান বা বাইফেল নেই তবু বলল, 'আই উইল শুট ইউ বাইট নাউ—'

তারপরে দেখা গেল প্রাগৈতিহাসিক কোন হিংস্র উন্মত্ত জন্তুব মতো বাহুল চ্যাটার্জি অমিতেব দিকে এগিযে আসছে, তাব পেছনে জ্যোতির্ময়।

উদভ্রান্তের মতো চাবদিকটা দেখে নিল অমিত। হঠাৎ চোখে পড়ল, তার পেছনের দেয়ালে কারুকার্যময় সুন্দব খাপে ডেকবেসন পীস হিসেবে একটা নেপালী কুকরি সাজিয়ে বাখা হয়েছে। লাফ দিয়ে কুকবিটা নামিয়ে নিল সে। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেটা রাহুলের পেটের নরম মাংসে ঢুকে গেল। আর রক্তে মেঝের কার্পেট সোফা ভেসে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপরই চেঁচামেচি আর্তনাদ আব হল্লা শোনা গেল। তারই মধ্যে সব শব্দ

ছাপিয়ে সতীব চিৎকার শুনতে পেল অমিত, 'পালান অমিতদা, পালান—'

কাকে যেন [illegible] দরজাটা খুলে [illegible] অমিত। সামনে [illegible] অথে [illegible] ছুটতে ছুটতে টের পেল [illegible] নিয়ে [illegible] ওদের পেছনে [illegible] ধরা পড়ে গেল। [illegible]

॥ সতেরো ॥

চারদিন পর জেল হাজতে কয়েক ডজন চোর গুণ্ডা নারীধর্ষকের সঙ্গে বসে ছিল অমিত। এর মধ্যে সে খবর পেয়েছে, রাহুল চ্যাটার্জি মারা যায় নি, হাসপাতালে দু দিন থাকার পর তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। হয়তো বেঁচে যাবে, তবে কিডনিটা চিরদিনের মতো প্রায় অকেজো হয়েই থাকবে। অমিত আরো জেনেছে, তার বিরুদ্ধে কেস সাজানো হচ্ছে—হত্যার কারণে গুরুতর আঘাত করার অপরাধ। অনায়াসেই অপরাধটা প্রমাণিত হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে, সতী নাকি এই কেসে সাক্ষ্য দেবে—তার স্বপক্ষে না বিপক্ষে, অমিত জানে না।

এই চারদিনে বাবা-মা-ভাই-বোনেরা তাকে দেখতে এসেছিল। সবাই তাকে ধিক্কার দিয়ে গেছে। বাবা স্পষ্টই বলে গেছে, তার বাড়িতে হত্যাকারীর জায়গা নেই। শূন্য চোখে অমিত শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

চারদিন পর বিকেলের দিকে হঠাৎ নীলা এল। পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'আমি সব শুনেছি।'

অমিত চুপ করে থাকল।

গাঢ় গভীর গলায় নীলা আবার বলল, 'আমি জানি আপনার মতো মানুষ যখন ছুরি চালিয়েছে তার কারণটা সাঙ্ঘাতিক—'

অমিতের ঠোঁট কাঁপল। ঝাপসা গলায় সে শুধু বলল, 'আমি—আমি—'

সহানুভূতিতে নীলার মুখ কোমল হয়ে এল। সে বলল, 'কিছু বলতে হবে না। আমি বিশ্বাস করি, আপনি অন্যায় করেন নি।'

অমিতের ঠোঁট কাঁপতেই লাগল।

নীলা বলল, 'আগেই আসতাম। কিন্তু আপনার বেইলের ব্যবস্থা করতে অনেকের কাছে ছোটাছুটি করতে হল। তাই আসতে পারিনি—'

অমিত এবারও চুপ। তার চোখ শুধু জলে ভরে যেতে লাগল।

দুদিন পর কোর্ট থেকে অমিতকে জামিনে বের করে সোজা তাকে নিয়ে রানীবাজার চলে এল নীলা। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে বলল, 'এখন বাড়ি চলে যান, পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

অমিত বলল, 'না।'

'কী হল?'

'বাড়িতে যাব না। বাবা যেতে বারণ করে দিয়েছে।'

'তবে কোথায় যাবেন?'

'তুমি—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।' এই প্রথম নীলাকে 'তুমি' বলল অমিত।

এক মুহূর্ত কি ভাবল নীলা। তারপর অমিতের একটা হাত ধরে বলল, 'এসো, এখন আমাদের বাড়িতেই চল। পরে যা হয় ভাবা যাবে—' অমিতকে নিয়ে একটা সাইকেল রিক্সায় উঠল সে।

এখন বিকেল। শীতের বেলা পড়ে আসছিল। মেরুদণ্ডের মতো সেই রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে অমিতের চোখে পড়ছিল, দু ধারের দোকান-পাট বাড়িঘর থেকে অগুনতি চোখ চমকে চমকে তাদের দেখছে। নীলার সঙ্গে সে যাচ্ছে, এটাই হয়তো তাদের নতুন চমকের কারণ।

অমিত কিন্তু ওদের কথা ভাবছিল না। তার মনে হচ্ছিল, তাদের এই সময়ে চারদিকের সব মানুষ যখন যুদ্ধরত তখন সে-ই শুধু দূরে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল কই? আঁচটা তার গায়েও এসে লেগেছে।

অমিতের মনে হচ্ছিল সবে তো শুরু, তার সামনে এখন অনেক, অনেক যুদ্ধ। কিন্তু খালি হাতে কি নিরন্তর যুদ্ধ চালানো যায়? সে জন্য নীলার মতো তীক্ষ্ণ শাণিত অব্যর্থ একটি অস্ত্র হাতে থাকা চাই। না, নীলাকে ছাড়া তার চলবে না।